পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানে[illegible] তারিখ

G.P. DS—2,000. 2-89

যুগ-বার্ত্তা

প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস
চন্দননগর
১৩২৭

মূল্য বার আনা

বোড়াইচণ্ডিতলা, চন্দননগর,

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস

হইতে

শ্রীরামেশ্বর দে

কর্ত্তৃক প্রকাশিত
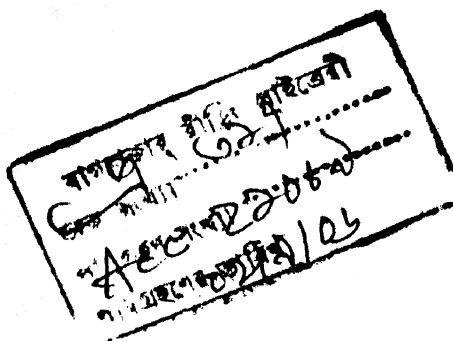
শ্রাবণ, ১৩২৭

সাধনা প্রেস,

চন্দননগর।

বিজ্ঞাপন

যুগবার্ত্তা "প্রবর্ত্তকে"রই কথা--দ্বিতীয় বর্ষের কয়েকটী প্রবন্ধ একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল। 'সাধনা'র মত ইহাও পুষ্পগুচ্ছ, 'প্রবর্ত্তকে'র বুকে যেমন যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন না করিয়াই পুনর্ম্মুদ্রন করা হইল। প্রবন্ধগুলি একটি বিষয় সংক্রান্ত নহে, তবুও একেবারে সূত্রশূন্যও নয়—যুগের উপর এগুলির প্রভাব আছে, অথবা যুগেরই প্রভাবে তাহাদের সবখানি ভরা; তাই যতই অস্ফুট হউক, সেগুলি একটি মূল সুরেরই বহুভঙ্গিম মূর্চ্ছনামাত্র, এরূপ বলা যাইতে পারে। নূতন যুগের ইঙ্গিতবাহিকারূপে যদি ইহাদের কিছু উপযোগিতা থাকে, তবে উহা সার্থক হউক।

প্রকাশক

৩০এ শ্রাবণ, ১৩২৭।

সূচী

যুগ-বার্ত্তা

আবাহন

ওগো নূতন বর্ষ, ওগো অনাগত—তোমায় অভিবাদন করি। তুমি অনন্ত কালনাট্যের এক ক্ষুদ্র গর্ভাঙ্ক, তোমার পরতে পরতে আমাদের ভাগ্যচক্রের কত আলেখ্য অঙ্কিত আছে—কত আশা কত নৈরাশ্য, কত সুখ কত দুঃখ, কত সম্পদ্ কত বিপদের ছবি আছে! দিনের পর দিন যাবে, তোমার নূতন তুলির রঙীন ছবিগুলি জীবনের সম্মুখে ধরে' দেখাবে—কখন আশায় উৎফুল্ল হব, কখন বা অভাবনীয় বিপদের সূচনা দেখিয়ে নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে—এমনি করে' সুখে দুঃখে, হাসি কান্নায় দীর্ঘ বৎসর কেটে যাবে। তারপর তুমি আবার পুরাতন হবে, নূতন এসে তোমার স্থান অধিকার কর্‌বে—ইহাই তোমার স্বাভাবিক গতি। আজ তুমি এসেছ—তোমায় অভিবাদন করি।

যোগসাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করেছে তার কাছে তুমি নূতন

নও, সে ভবিষ্যদৃষ্টি দিয়ে তোমার সবখানি দেখ্‌তে পাচ্ছে—সমুদ্রের তরঙ্গ কাটিয়ে নাবিকেরা তাদের ক্ষুদ্র তরীখানি যেমন করে' সাগরবক্ষে নিয়ে যায়—যোগদৃষ্টিশালী ভারতের মহাত্মাগণ তেমনি করে' অবহেলে তোমায় অতিক্রম করে' চলেছেন। অনন্ত মহাকালের বুকে একস্থানে ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগটীর কথা লেখা আছে, সেই দিনটি লক্ষ্য করে' তুমি এসেছ, দূরাগতকে কাছে এনে দেবার জন্য—তোমায় অভিবাদন করি।

সমুদয় জগতের ভাগ্যাকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, বরষের শেষে বিদ্যুৎ-বিকাশের মত শান্তির আভাস মুহূর্ত্তে প্রকাশ হয়ে মুহূর্ত্তেই বুঝি মিলিয়ে যায়, অহঙ্কারের জাগ্রতমূর্ত্তি ধুলিশায়ী না হ'লে স্থায়ী শান্তি অসম্ভব—তাই সমগ্র মিত্রশক্তি প্রলয়হুহুঙ্কারে মেদিনী কম্পিত করে' তুলেছে—হে নববর্ষ, মনুষ্যজাতির হৃদয় হ'তে হিংসা-বৃত্তি মুছে দিয়ে চিরশান্তি ফিরে দেবে—তাই তোমায় অভিবাদন করি।

তোমায় অভিবাদন করি। কঠোর তপঃপরায়ণ ভারতবাসীর জন্য আজ তুমি কি সিদ্ধি এনেছ? তোমার আগমনে কোটী কোটী নরনারী কৌতূহলপূর্ণনয়নে তোমার পানে দৃষ্টিপাত করছে, নূতনের আশায় উৎফুল্ল হয়ে ভারতের নানাজাতি একত্র এক-ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তোমার দান মাথাপেতে নেবে বলে' উৎকণ্ঠিত হয়েছে—সে দানে তার হৃদয় পূর্ণ কর, আশার পথ উজ্জ্বল হোক্—শুভের পথ, মঙ্গলের পথ, উন্নতির পথ—ভারতের অবারিত হোক্।

আবাহন

হে বিধাতার লিপিবাহক নববর্ষ, সারা পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্তৃ-রূপে আজ আমাদের কুটীরদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ—প্রতিদিন জগতে তুমি নূতনবার্ত্তা শোনাবে, কখন ভৈরবগর্জ্জনে মনুষ্যজাতির হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিয়ে তুল্‌বে, কখন বা রমণীকণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীতের মত ললিতস্বরে তাদের হৃদয় মুগ্ধ কর্‌বে, কখন প্রলয়ঙ্কর বীভৎস চিত্রখানি উন্মুক্ত করে পৃথিবীতে ভীষণাবর্ত্তের সৃষ্টি কর্‌বে, কখন বা অমৃতশীতল কণ্ঠের আশ্বাসবাণী আলাপ করে' মানবের হৃদয় মধুর রসে ভরিয়ে তুল্‌বে—কে জানে তোমার ভবিষ্যৎ কাল-গর্ভে কি আছে? আমরা, যারা স্বর্ণযুগের আশায় মহাঋষির মধুর রাগিণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছি, তাদের তুমি সুপথে পরিচালিত কর। আমরা জানি আমাদের কাতর কণ্ঠ বিধাতার হিরণ্ময় সিংহাসন হ'তে প্রতিহত হয় নাই, তাঁর অপার্থিব করুণা মাথায় বয়ে তুমি আজ আমাদের নিকটে এসেছ—মর্ত্ত্যের সুখদুঃখ হাসিকান্না ভুলিয়ে দাও—ভুলিয়ে দাও সকল প্রকার নীচতা, সঙ্কীর্ণতা, দীনতা—পৃথিবীর নীচ আকর্ষণ হ'তে মুক্ত করে' আমাদের মানুষ করে' দাও, দেবতা করে' দাও—আমরা তোমায় অভিবাদন করি।

ব্রহ্মতেজ

যার জীবনে সংগ্রাম নাই, সে সমাজের কোন উপকারে আসে না—সেরূপ নিরর্থক জীবন দেখিতে শুনিতে ভাল হইলেও প্রকৃতির সদা আন্দোলিত ধরাপৃষ্ঠে তাহার স্থান নাই। এ পৃথিবী শান্তিনিকেতন নহে, উদ্দাম প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্যে সতত চঞ্চলা, মথিতা, বিত্রস্তা।

ইহার কারণ পৃথিবী যে ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে এরূপ কেহ অনুমান করিবেন না। প্রকৃতি আপন পুরুষের অন্বেষণে ব্যস্ত, তিনি আঁতি পাঁতি করিয়া বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছেন মাত্র। পৃথিবীর ইতিহাস যতটুকু লোকচক্ষুর গোচর হইয়াছে, তাহা অনুশীলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, স্মরণাতীত কাল হইতে এই একই লীলা প্রকটিত হইয়া আসিতেছে।

কত ঝঞ্ঝা, কত বজ্র উল্কাপাত, কত ভূকম্পন, কত যুদ্ধ বিগ্রহ মহামারী দুর্ভিক্ষ, কত অত্যাচার অনাচার উৎপীড়ন যুগে যুগে অনুষ্ঠিত হইয়াছে—কত খণ্ড-প্রলয়—মহাপ্রলয়—কখন আঁধারে ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া গিয়াছে, কখন বা সিন্ধুজলে ধরণী নিমগ্না হইয়াছে, কিন্তু এখনও সেই আমি সেই তুমি ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছি যাইতেছি—পাকে পাকে জীবন যায় যায় করিয়াও যায় নাই—

অমর আত্মা কঠোর আবর্ত্তনের কেন্দ্রে নিষ্পেষিত হয় নাই, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া লোপ পায় নাই—মিলনপ্রয়াসী প্রকৃতির চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া অনন্ত বিকাশের মাঝে লুকোচুরি খেলিতেছে।

জীবনের সংগ্রাম, সে আমাদের খেলা—এ অমৃতের খেলা, আনন্দের খেলা আমরা সাধ করিয়াই খেলিতেছি—মূঢ় বিপন্ন মোহগ্রস্তই অবসাদ ভোগ করে। আজ খেলিতে আসিয়া যাহারা আপনাদিগকে ক্লান্ত মনে করিতেছেন, 'তেনামান্ চলে' বলিয়া আমরা তাহাদিগকে সাড়া দিই—আমাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাহারা আমাদের নিকটে আসুন—লতা-গুল্ম-বিজড়িত ছায়া-শীতল বিটপীর কুঞ্জে আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ছেদহীন অবকাশহীন দৌড় দিই, নতুবা চঞ্চলা প্রকৃতি আমাদের ধরিয়া ফেলিবে।

এরূপ অবস্থায় পরাভব-স্বীকার-পরায়ণ সামর্থ্যহীন জীবই প্রকৃতির হস্তগত হইতে চাহে। কিন্তু দেখিতে হইবে প্রকৃতির ইচ্ছা কি? এই অবস্থায় আমাদের লাভ করিয়া যদি তিনি আমাদের কণ্ঠে পরিণয়মাল্য প্রদান করিয়া পতিত্বে বরণ করিয়া লইতেন—কথা ছিল না, কিন্তু তিনি চাহেন অনন্তশক্তিধর পুরুষকে, মৃত্যুঞ্জয় শিবকে, নির্ব্বিকারচিত্ত মহাযোগী শঙ্করকে; নতুবা মহাকালী গ্রাস করিয়া ফেলিবেন সংগ্রাম-বিরত অলসকে, কেননা এ পৃথিবী অসমর্থ জীবের জন্য নহে, পরন্তু ভোগসামর্থ্যবান অজেয় অমর শিবের জন্য।

আপনারা কি দেখিতে পান না, মরণভয়ে ভীত অনিচ্ছায় শক্ত

শত জীব শ্মশানকালীর লেলিহান রসনায় সংলগ্ন হইয়া আপনাদের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব অকারণ লুপ্ত করিতেছে—আপনারা কি দেখিতে পান না, কুহকিনীর মায়ামোহে বিভ্রান্ত হইয়া পদে পদে নৈরাশ্যের জমাট আঁধার ঠেলিতে ঠেলিতে অবসন্নহৃদয়ে জীবকুল অজস্র অশ্রুপাতে হৃদয় ভাসাইয়া দিতেছে—আপনারা কি দেখিতে পান না সংগ্রাম-বিমুখ ভীরু কাপুরুষ প্রকৃতির তীক্ষ্ণ শূলাঘাতে জর্জ্জরিত মৃতপ্রায় হইয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছে—রোগে শোকে অনুতাপে অবসন্নতায় অমৃতের পুত্রগণ কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত!

ভারতের মোহ দূর করিয়া প্রকৃতির তাড়নায় সে যাহাতে ক্রমাগত দৌড়াইতে পারে তাহার প্রতিকার আমরা করিতে চাহি—পরিপূর্ণ জীবন লাভ না করিয়া শ্রম-কাতরতা-পরবশ যাহাতে সে প্রকৃতির শরণাগত না হয় সেই শিক্ষাই প্রচার করিতে চাহি। অমৃতের পুত্র ঋষি অরবিন্দ যেমন বলিয়াছিলেন, "আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার পায়ে আছে—শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে ব্রহ্মতেজও আছে।" সেই ব্রহ্মতেজে ভারতের হৃদয় পূর্ণ করিয়া তুলিতে চাই—ইহাতে আমাদের যে যাহাই বলুক তাহা আমরা গ্রাহ্য করিব না।

শিক্ষা

শিক্ষাই যে মানুষকে মহীয়ান্ করিয়া তুলে, শিক্ষাই যে জাতিকে শ্রেষ্ঠাসন দিতে পারে এতদ্বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। এক্ষণে এই একশত বৎসরের শিক্ষায় বাঙ্গালী জাতি কতটা উন্নতির পথে অধিরোহণ করিয়াছে, কতটা জগতের সম্মুখে আপনাদের মর্য্যাদা সুপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে—এই সকল বিষয় লইয়া অধুনা রাজপ্রতিনিধিগণ এবং শিক্ষিত জনসাধারণ বিশেষ চিন্তা করিতেছেন। এরূপও শোনা যাইতেছে যুদ্ধান্তে এতদ্ সম্বন্ধে একটা বিপুল পরিবর্ত্তন হইবে।

আজ শিক্ষিত যুবকগণের সম্মুখে ইহা সমস্যার কথা। স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং রাজা রামমোহন রায় যখন বাংলার দুইটী পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের নেতা ছিলেন, তখন রাজার মতে ইংরাজী শিক্ষার দ্বারাই গণিত ইতিহাস দর্শন চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি উচ্চ বিদ্যাগুলি আয়ত্ত করিতে হইবে, এইরূপ স্থিরীকৃত হয় এবং সেই ভাবেই এই শত বৎসর শিক্ষাকার্য্য চলিয়া আসিতেছে। বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ না করিলে ইতিহাস দর্শন বিদেশী ভাষায় আয়ত্ত করা যে কত শ্রমসাধ্য তাহা বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেমস্ফোর্ড বাহাদুরও বুঝিয়াছেন—তিনি তাই প্রস্তাব করিয়াছেন দেশীয় ভাষাতেই ভারতবর্ষে উচ্চ শিক্ষা দান

করিতে হইবে। রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সেই অতীত যুগে এই প্রস্তাবই করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দেশীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রচলিত হইলে শতকরা নিরনব্বুই জন শিক্ষিত শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরাজী শিখিয়াও আমরা বড় কম অগ্রসর হই নাই, সমগ্র জগতে বিভিন্ন জাতিগুলির সহিত আমরা আজ পরিচয় স্থাপন করিতে সমর্থ—ইহা ইংরাজী শিক্ষারই সুফল বলিতে হইবে।

যে দিক্ দিয়াই হউক জাতি উন্নতির পথে পরিচালিত হইবে, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। ইংরাজরাজ তাঁহাদের মনের মত মানুষ গড়িয়া তুলিবেন এবং এতদিন যে সে কার্য্য প্রকৃষ্টরূপে ঘটিয়া উঠে নাই—ইহাই আশ্চর্য্য।

রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হইবে, ব্রিটিশরাজ্যে শান্তি বিরাজ করিবে—ব্রিটিশপ্রজা শিক্ষালাভান্তে উপার্জ্জন করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিবে—ইহাই বাহ্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যে শিক্ষার দ্বারা এইরূপ বিকাশ বাহিরে ফুটিয়া উঠে তাহারই আয়োজন রাজপ্রতিনিধিগণ করিবেন, ইহা ত বিচিত্র নহে। কিন্তু আজ আমরা—সেই অতি প্রাচীন উচ্চ অধ্যাত্ম-তত্ত্বের গৌরবমণ্ডিত আর্য্যসন্তান—আমরা কি করিতেছি? রাজা বিদেশী, সুতরাং আমাদের বৈদেশিক শিক্ষা অর্জ্জন করিতেই হইবে, কিন্তু আমাদের সনাতন শিক্ষা কোথায়—যে শিক্ষায় আমরা বুঝিয়াছিলাম আমরা অমর, আমাদের জড় দেহ দেবতার আবাস-ভূমি—যে শিক্ষায় আমাদের মধ্যেই সন্ধান পাইয়াছিলাম সমুদয়

বিশ্বের অন্তর্নিহিত মহাশক্তির দিব্যরূপের, যার লেলিহান রক্তবর্ণ জিহ্বা দিয়া আস্বাদ করিতাম সহস্রদলনিঃসৃত অমৃতধারাকে, যে শিক্ষার প্রভাবে অনুভব করিতাম আমারই মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় পরমব্রহ্মকে, প্রতি ইন্দ্রিয়ে লক্ষ্য করিতাম বজ্রধারী ইন্দ্রকে, মিত্র বরুণ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, সমগ্র দেবতার শক্তি লইয়া কাঁপাইয়া তুলিতাম ভূলোক দ্যুলোক অন্তরীক্ষ বজ্রগম্ভীর প্রণব শব্দে—আজ আমাদের সে শিক্ষা কোথায়, আজ আমাদের সে দিব্য অনুভূতি কোন্ রসাতলে !

আমরা দেশের সর্ব্ববিধ আন্দোলনের মধ্যে আজ এই প্রাচীন তত্ত্বের পুনরুদ্ধার করিতে চাই ; তাই আহ্বান করি সেই সকল মহাকর্ম্মীদের—যাঁহারা সমর্থ হইবেন পথের বিভীষিকা, পথের বিঘ্নগুলিকে ধীশক্তি প্রকাশে খর্ব্ব করিতে, যাঁহারা প্রবৃত্তি আসক্তির উজ্জ্বল বহ্নিমালার উপর বীরের মত ঢালিয়া দিতে পারিবেন সাধনার সুশীতল সলিলরাশি। নির্ব্বাপিত হউক আকাঙ্খার তীব্র হুতাশন, জ্বলিয়া উঠুক প্রেরণার আহুতিতে যজ্ঞভূমে তপস্যার দুর্জ্জয় বহ্নিরাশি।

কে আছ ব্রতী—আজ তোমায় সাধক আহ্বান করিতেছে—ভগবৎকার্য্যে অগ্রসর হও—ভারতের প্রাচীন শিক্ষাবিস্তারকল্পে সর্ব্বত্যাগী হইয়া বাহির হইয়া আইস—তপস্বীর দ্বারাই ভারতের শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইবে। শিক্ষক হইবে সত্যবাদী ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়। অন্যথা হিন্দুর শিক্ষা সার্থক হইবে না। আসক্ত ব্যক্তিকে শিক্ষাকার্য্য প্রচলিত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে দাও

—তোমরা বাহির হইয়া পড়। বৃক্ষতলে, প্রান্তরে, পর্ব্বতশৃঙ্গে গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে তোমাদের কণ্ঠধ্বনি আবার শুনিতে চাই। শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি এখনও প্রচুর অন্নের সংস্থান করিয়া দিবেন, পয়স্বিনী গাভী এখনও অমৃত প্রদান করিবে, অন্নপূর্ণার সন্তান অনাহারে মরিবে না। জাগাইয়া তোল সেই পরাজ্ঞানকে, সেই ব্রহ্মভাবে ভারতবাসীর হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া তোল, অন্ততঃ ধীর-ভাবে দশ বৎসর এই কঠোর ব্রতে ব্রতী হও।

আর জাগাও বঙ্গজননী অন্তঃপুরচারিণী মহালক্ষ্মীদের—বীর-প্রসবিনী জগদ্ধাত্রী কার ভয়ে ভীতা সঙ্কুচিতা? কোন্ কাপুরু-ষের কটাক্ষে মহামায়া চঞ্চলা সন্ত্রস্তা? সর্ব্বক্ষেত্রে অক্ষর-পরিচয়ের আবশ্যক নাই; রাশি রাশি পুস্তকের পাতা উল্টাইলেই শিক্ষা হয় না। হিন্দু মন্ত্রশক্তির মর্য্যাদা ভুলিয়াছে। বর্ণদ্বয় মন্ত্রসাধনে রত্নাকর মহাকবি হইয়াছিলেন—গার্গী মৈত্রেয়ী মন্ত্র-সাধনে সিদ্ধা ছিলেন। আত্মজয়ী অভী হইয়া কার্য্য আরম্ভ কর —জগতে জানাও তোমার দ্বারা অমঙ্গল অশুভ সম্ভব হইবে না— তারপর তোমার পথের পরিপন্থী যে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ তার বিচারের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন।

গতি-নির্দ্দেশ

সমগ্র জগৎ যখন নবোত্তমে বিজয়লালসায় উত্তোগপর্ব্বের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দিল—ভারতবর্ষের মনীষীবৃন্দ—এই জগৎমহালীলায় ভারত কোন্ অংশ অভিনয় করিতে পারে, তাহার চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জগতের এই মহাপরিবর্ত্তনের পর ভারতের অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটিবেই, ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই, তাই সেও আজ এই মহাযজ্ঞের সমিধ্ সংগ্রহে উদাসীন নহে। শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময়ে কাঠবিড়ালীও যেরূপ তাহার ক্ষুদ্র সামর্থ্য রাজকার্য্যে নিয়োজিত করিতে গিয়া নির্য্যাতিত হইয়া পরিশেষে শ্রীরামচন্দ্রের করকমলস্পর্শে আপনাকে পরম চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছিল, ভারতবর্ষও তদ্রূপ এই মহাযুদ্ধে তাহার অকিঞ্চিৎকর দান উৎসর্গ করিয়াও রাজশক্তির নিকট সবিশেষ সম্মান লাভ করে নাই—সম্প্রতি ইংলণ্ডের সমর সচিব লয়েড্ জর্জ্জ যুদ্ধসভায় দুইজন প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়াই ভারতবর্ষকে কৃতার্থ করিয়াছেন। বিশেষ বাঙ্গালীজাতি এই সম্মান মহোৎসাহে গ্রহণ করিয়াই আপনাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে প্রয়াসী।

এই জগদ্ব্যাপী মহাকুরুক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বস্তুগত ঐশ্বর্য্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ ইংলণ্ডের আবছায়ায়

শক্তিশালিনী অষ্ট্রেলিয়া ক্যানেডা, ভারতের তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও ইংরাজরাজের যে সহায়তা করিতে সমর্থ হইয়াছে ভারতবর্ষ তাহা পারে নাই। ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিয়াই যে এই মহা আহবে আপনার সর্ব্বস্ব বলি দিতে কুণ্ঠিত তাহা নহে, তাহার দিবার কিছুই নাই। এ বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ, ইহাতে কেবল নররক্তপাত করিলেই হইবে না, বিজ্ঞানসম্মত রণ-কৌশলে সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করা চাই; বিজ্ঞানোদ্ভূত রণতরী, মকরপোত, আকাশ-যান, বৈজ্ঞানিকক্রিয়াকুশল অস্ত্র শস্ত্রাদিরও প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এই সকল বিষয় হইতে একেবারেই বঞ্চিত, তবে আত্মবলি দিতে পরাঙ্মুখ নহে—সেদিন ভীরু বাঙ্গালীও সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এই ধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে। ধর্ম্মযুদ্ধ বলি, কেননা ভগবান্ এই মহাকুরুক্ষেত্রের আয়োজন করিয়াছেন জগতের বিশেষ পরি-বর্ত্তন মানসে, সে পরিবর্ত্তনে পৃথিবী উন্নতযুগের পথেই সমধিক অগ্রসর হইবে।

সেদিন অমৃতবাজার পত্রিকায় পৃথিবীর সবল, সুস্থ ও কার্য্য-ক্ষম পুরুষের তালিকাসংযুক্ত এক ফর্দ্দ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে দেখিলাম জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রিয়ার লোকসংখ্যা তিন কোটী মাত্র, তুরস্কের আধ কোটী, আর ব্রিটিশরাজের এগার কোটী। এই এগার কোটী ব্রিটিশ প্রজার মধ্যে সাড়ে সাত কোটী ভারতের আর দুই কোটী ইজিপ্টের। কি গ্রহ! এই এগার কোটি লোক যদি যুদ্ধে পটু হইত তাহা হইলে ইংলণ্ডকে আজ জগজ্জয়ী হইতে বেগ পাইতে হইত না।

যাউক এই সকল কথা আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, আমরা কেবল পাঠকবর্গকে দেখাইতে চাই ভারতবর্ষ বস্তুগত ঐশ্বর্য্যে সামর্থ্যবান্ হইয়াও ভগবদিচ্ছায় আজ তাহারা জগতের এই মহাসংগ্রামে মানুষ বলিয়া পরিগণিত হইল না। অনেকের ধারণা, ইংরাজরাজ ইচ্ছা করিলেই ভারতবর্ষ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিত—আমরা একথায় বিশ্বাস করি না। দেড়কোটী ইংরাজের ইচ্ছায় এই মহাদেশ পরিচালিত হইতে পারে না, ইহার ভিতর ভগবদিচ্ছা আছে, আমরা তাহাই আলোচনা করিতে চাই।

ভাগবত ইচ্ছা ছিল বলিয়াই য়ুরোপের অপরাপর শক্তি থাকিতেও ইংলণ্ড ভারতবর্ষের শাসক সম্রাট্ ভাগ্যনিয়ন্তা। এই ইংরাজ-অধিকারেই আমাদের জাতি সঙ্ঘবদ্ধ হইবে। যাঁহাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, যাঁহারা অন্তর্দ্দর্শী, তাঁহারা অনায়াসেই দেখিতে পাইবেন, বিবিধ অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়াই ভারতবর্ষ আজ মহা-জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বর্ত্তমান রাজ-শক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া যাঁহারা ভারতবর্ষকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। ভগবদ্‌বিধানেই ভারতের বহিঃশক্তি অন্তর্হিত —ভারতবর্ষ যদি অনন্যমনা হইয়া পশুবল দেখাইতেই কৃতসঙ্কল্প হয়, তবে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী, এমনকি ভারতবর্ষ যদি কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে দেহ মন অর্পণ করে, যদি তাহার ফলে পাশ্চাত্য জাতিগণের মত রাজনীতিক্ষেত্রে বড় বড় অধিকার

অর্জ্জন করে তাহাতেও ভারতের ভাবীফল মঙ্গল হইবে না। ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য্যহীন হইয়াছে কেন—এতদিন দীনহীন হইয়া সে কোন্ শক্তিতে আপনাকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে—সেই অমূল্য রত্নটীই নিজস্ব এবং তাহারই অনুশীলনে ভারতের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

উহা ভারতের সনাতন ধর্ম্ম। আজ এই সনাতন ধর্ম্মের ছত্রতলেই, ভারতের জাতি গঠিত হইয়া উঠিবে—ইহাই ভগবদ্-আদেশ। এই আদেশপালনের জন্য আমরা সমস্তই নিয়োগ করিতে প্রস্তুত আছি,এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে আমাদের হৃদয়ের প্রতি রক্তবিন্দু উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইব না, এই জ্বলন্ত বিশ্বাসে আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে, বিলম্ব করিলে চলিবে না—এই মুহূর্ত্তেই অমাদের বাহির হইতে হইবে। আমরা বর্ত্তমান বিভিন্ন কার্য্যধারার বিপরীত আচরণ করিব না, দেশের পূর্ণ শক্তিকে কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ শীঘ্র শীঘ্র শক্তির শুদ্ধি বিধান করিতেছেন—তাঁর কার্য্যে অন্তরায় না হইয়া ভগবন্নির্দ্দেশিত পথেই আমাদের পরিচালিত হইতে হইবে।

ভারতের বেদ, ভারতের উপনিষদ্, ভারতের গীতা, ভারতের পুরাণ ইতিহাস, ভারতের শিক্ষা দীক্ষা পুনঃ প্রচারিত হউক—পাশ্চাত্যের শিক্ষা ভারতের ভাবে গড়িয়া জীবনোপযোগী করিয়া লও—ভারতের যে বিশেষত্ব তাহারই পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ভারতের যোগপদ্ধতিকেই ভারতীয় জীবনের শিক্ষা-কেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে—ভারতে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা

হইবে, পরে চাই স্বরাজ—ভারতের নরনারী দেবতা হউক, তবে আসিবে ভোগ ঐশ্বর্য্য, ভারতের দৃষ্টি জগতের প্রলোভনে ভিন্ন দিকে প্রধাবিত হইলে আমরা আবার পিছাইয়া পড়িব।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ভারতে অনেক সংস্কারসমিতি দেখা দিয়াছে, ক্ষতি নাই; কিন্তু ভারতের এই সনাতন ভাব হইতে যে একপদ অন্যদিকে যাইবে, তাহার দ্বারা ভারতবর্ষের কোনও উপকার হইবে না। ভারত যে আজ জাতি গড়িতে উদ্যত, উহা কেবল ভারতবর্ষের জন্য নহে—আজ ধরিত্রী ভারতের এইরূপ জাতিকেই তাহার অস্তিত্বের জন্য আহ্বান করিতেছে। আমাদের কিছু নাই, কেবলমাত্র ভগবান্ আছেন—তাঁর উপর অকপট বিশ্বাস রাখিয়া নবীনদিগকে অগ্রসর হইতে বলি।

প্রেম

সংসারারণ্যে যখন একটা বুনো ফুলের মত ফুটে উঠেছিলুম, তখন কত বন্ধু, তাদের কত গুন্ গুন্ আনন্দের ধ্বনি আমার চারি-দিকে মুখরিত হ'ত—কিন্তু কৈ আমার প্রাণ তাতে তৃপ্ত ছিল না। যখন সবাই এসে আমার গুণের কথা বল্‌ত, আমার মান যশের কাহিনী শোনাত, তখন মনে মনে হাসতুম্, কেননা তাদের সব কথা ভুল—আমার এমন কিছু ছিল না, যা নিয়ে আমি গর্ব্ব কর্‌তে পারি।

তবু কিন্তু বন্ধুর অভাব ছিল না, আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হ'য়ে লোকের চোখে পরমানন্দেই দিন কাটাতুম, কিন্তু মর্ম্মে মর্ম্মে যে তুঁষের আগুন জ্বলে' থাক্‌ত তার দহনে ছট্‌ফট্ করে' বেড়াতুম। বিদ্যা যশ ধন মান এসবই ছিল, কিন্তু কিসের অভাবে আমি দীন হীন কাঙ্গালীর মত ঘুরে বেড়াতুম তা নিজেই ঠিক কর্‌তে পার্‌-তুম না— তখন কে জানে কলঙ্কসাগরেই আমার তপস্যার ধন আছে!

সে একটা বড়ই অবসাদের দিন। পৃথিবীর ভোগগুলো আমার আশে পাশে ছড়িয়ে থেকে তাদের সজাগ দৃষ্টি আমার প্রাণে বর্ষণ কর্‌ছিল—বাণবিদ্ধ হরিণীর মত আমি কাতর হ'য়ে ঐ ঊর্দ্ধে, যেখানে অসীম নীলিমা অনন্তের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে,

সেই দিকে চেয়েছিলুম, সহসা একটা আশার আলো বিদ্যুতের মত আমার চোখ ঝল্‌সে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে একটি অপূর্ব্ব সুর বেজে উঠ্‌ল—আমার হৃদয় মন আকুল করে' সে মুরলীধ্বনি আমার সাম্‌নে এসে বাজ্‌তে লাগ্‌ল। তখন ভেবেছিলুম স্বপ্ন দেখ্‌ছি, দু'হাতে চোখের পাতা ভাল করে' মুছে স্পষ্ট করে' চেয়ে দেখ্‌লুম, মোহন বাঁশি হাতে এক অপূর্ব্ব পুরুষমূর্ত্তি। সে অমিয়-নিছানি ভুবনমোহন রূপ দেখে সব ভুলে গেলুম—পদমর্য্যাদা, স্থান কাল, বিচার আচার, ধর্ম্মকর্ম্ম, পাপপুণ্য সমস্ত এক করে' নিবিড় আলিঙ্গনে তারে শত চুম্বনে লাঞ্ছিত কর্‌লুম। তারপর চোখের পলকে সব শেষ হ'য়ে গেল—কেবল বুকের মাঝে জ্বলন্ত দীপশিখার মত জেগে রইল সেই আনন্দের স্মৃতিটী।

এই স্মৃতির রেখাটী ধরে' তার সঙ্গে আলাপ করে' [illegible]লুম। তন্ময় হ'য়ে যখনই লজ্জা মান ভয় উপেক্ষা করেছি তখনই আমার হৃদয়-দেবতা আমার সাম্‌নে উদয় হয়েছেন; কিন্তু কি নির্ম্মম, কি পরুষ, কি উদাসকরা তার উপদেশ, মধুর স্বরে কি কঠোর বার্ত্তা বাঁশীর মুখে সে ঘোষণা কর্‌ছে! (এই পুরুষের প্রেমেই নাকি যিশু আষ্টেপিষ্টে পেরেকবিদ্ধ হ'য়ে প্রাণ দিয়েছে, সক্রেটিশ বিষপাত্র নিঃশেষে পান করেছে, বৃন্দাবনের রাধারাণী কলঙ্ক-সাগরে ডুবে মরেছে—এর প্রেমেই রাজপুত্র বুদ্ধ সাম্রাজ্য ত্যাগ করে' পথের কাঙ্গাল হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে, সোণার গৌর সুনীল জলধিগর্ভে প্রবেশ করেছে, রামকৃষ্ণ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়েছে) এই মহাপ্রেমিকের সঙ্গ কর্‌লে লাঞ্ছনা সহ্য কর্‌তে হয়,

স্বর্ণকলেবর কালি হ'য়ে যায়, এ পৃথিবীতে মাথা গুঁজে থাক্‌বার স্থান পাওয়া যায় না। কি সর্ব্বনাশ! আগে যদি জান্‌তুম তবে এমন বিষ সাধ করে' পান কর্‌তুম না। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি আমায় ভুলিয়ে দাও, তোমার সৌম্য শান্ত অমৃতময় মূর্ত্তি আমার মন থেকে মুছে দাও, তোমার পাগলকরা অমৃতশীতল কণ্ঠের বাণী আর যেন কর্ণে প্রবেশ না করে। হরি হরি! এত যে অনুনয় বিনয় সবই ব্যর্থ হ'ল—দেশে দেশে প্রচার হ'ল আমি সেই সর্ব্বনেশেকে ভালবেসেছি, চারিদিক থেকে উপদেশ তিরস্কার লাঞ্ছনা বৃষ্টিধারার মত আমার উভয় কর্ণে তীরের মত বিদ্ধ হ'তে লাগ্‌ল—ভোল, ভোল, ভোল—কিন্তু আর ত ভুল্‌তে পারি না, আর ত তারে হৃদয়-আসন হ'তে নামাতে পারি না—"শ্যাম কলঙ্কিনী জেনেছে সকলে আর কারে করি ভয়?"

আজ আমি কলঙ্কিনী—আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই আমায় দেখ্‌লে মুখ ফিরিয়ে চলে' যায়। ঘরের ভেতর চুপ করে' বসে' আমার কলঙ্কের কথা ভাবি আর আনন্দে সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে! আজ যে কলঙ্কের ডালি আমার মাথায় উঠেছে, জনে জনে যেন সাধ করে' সে কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলে লয়—আমার হৃদয়-দেবতার কাছে এই প্রার্থনা দিবানিশি কর্‌ছি।

ওগো তোমরা সবাই আমায় ঘৃণা কর—তোমাদের কৃষ্ণ-প্রেমের দায়ে পড়্‌তে হবে না—তবু তোমাদের প্রেমের দুটো কথা বলি শোন। প্রেম পৃথিবীর স্পর্শে মলিন হ'য়ে গেছে, এই মরজের মাঝে রক্তমাংসের কুৎসিৎ আকর্ষণে, রিরংসার অধিষ্ঠানে

প্রেমের আস্বাদ নাই—সেখানে আছে আসক্তি, সেখানে আছে মোহ, সেখানে আছে মৃত্যুর আহ্বান। কৃষ্ণপ্রেম স্বর্গের—সে জ্ঞানোদ্ভাসিত কৃষ্ণপ্রেমে শিশ্নোদরবৃত্তি সজাগ হ'য়ে উঠে না, ধমনীতে রক্তের প্রবাহ ছোটে বটে কিন্তু তার গতি ঊর্দ্ধ দিকে, অমৃতের দিকে, সচ্চিদানন্দের দিকে। যদি এই পৃথিবীতে স্বর্গের দুন্দুভি বাজাইতে চাও, তবে এই কৃষ্ণপ্রেমেই ইহসর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে হবে—এ কালীয়-সাগরে ডুব দিতে হবে। এ ছাড়া আনন্দ-ধামে পৌছিবার আর অন্য পন্থা নাই।

ভারত ছাড়া কথা নাই। কবি গাহিয়াছেন, "এই দেশেতে জন্ম আমার, যেন এই দেশেতে মরি!" পৃথিবীর সকল জাতিই তাহাদের স্ব স্ব জন্মভূমিকে জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়াই জানে, আজ তাহার অভিব্যক্তিস্বরূপ ফরাসীজাতি স্বদেশরক্ষার জন্য কেমন অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে অবলোকন কর--স্বজাতির মর্য্যাদা, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য য়ুরোপের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিও হৃদয়ের সবটুকু রক্ত কেমন হাসিমুখে ঢালিয়া দিতেছে একবার লক্ষ্য কর। একবার ভাবিয়া দেখ যাহাদিগকে তোমরা ম্লেচ্ছ বল, অনাচারী বল, তাহারা কত বড় স্বদেশপ্রেমিক, তাহারা পরস্পর কেমন মধুর ভ্রাতৃত্বভাবে বিজড়িত—সমবেদনায় তাহাদের হৃদয় কেমন যুগপৎ ব্যথিত হইয়া উঠে।

দেখ, আমাদেরও দেশ আছে—সে দেশ ভারতবর্ষ। তাই শত মুখে ভারতবর্ষের কথা কহিতে ইচ্ছা করে। যদি একনিষ্ঠ হইয়া মোক্ষের জন্য প্রতিদিন শতবার 'ভারতবর্ষ,ভারতবর্ষ' বলিয়া জপিতে পার, তাহা হইলেও যথার্থ দেশপ্রীতি জাগিয়া উঠে—পবিত্র স্বদেশপ্রেমের বারিস্রোতে মনের কালি মুছিয়া যাইতে পারে। স্বদেশীযুগের পর হইতে দেশপ্রীতি বলিয়া একটা জিনিষ দেশের মধ্যে দেখা যাইতেছে বটে কিন্তু সে প্রেম ধার করা,

তাহার ফল বিষময়। ভারতবর্ষের প্রকৃত কল্যাণ তদ্দ্বারা বিশেষ কিছু হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। ভারতবর্ষ আজ পরাধীন বটে, কিন্তু সে বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্ম গতানুগতিক প্রথাটি অবলম্বন করা কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা আজ ভাবিবার দিন আসিয়াছে।

দেশের বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর দল হইতে বিপ্লব-বাদী দল, সকল শ্রেণীকেই আজ জিজ্ঞাসা করি—যে প্রথায় তাঁহারা ভারতবর্ষের উন্নতি করিতে প্রয়াসী, যাহার জন্ম তাঁহারা ইহজীবনের অনেক ভোগেই জলাঞ্জলি দিতে কৃতসঙ্কল্প—সে প্রথাটা কোথাকার? সে কি ভারতের? সে কি শ্রীভগবানের প্রত্যাদেশ, না পরানুকরণের চরম পরাকাষ্ঠা, বিদেশের ইতিহাস-অর্জ্জিত একটা বাহ্যিক জ্ঞান? আবেগের তাড়নায় মানুষী-বুদ্ধির প্রেরণায় ভারতবর্ষের কোন কল্যাণই সম্ভবপর হইবে না, ইহা ধ্রুব সত্য।

ভারতবর্ষের মঙ্গল উদ্দেশ্যে যে প্রবল স্রোতঃ দেশের মধ্যে প্রবহমান উহা ভারতের নহে, য়ুরোপের দান—তাই তাহা ভারতের উপযোগী নহে। আধুনিক ভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায় বৈদেশিক আন্দোলনের অনুকরণ করিয়া আবার নূতনভাবে ভারতে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাহার পরিণামও ভবিষ্যতে শুভ হইবে না। (ভারতের কি রাজনীতি, কি সমাজ-নীতি, কি বাণিজ্যনীতি, সমস্তই এক সনাতন ধর্ম্মস্রোতের অনুগত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।)

যুগ-বার্ত্তা

শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট ইহা একটা প্রহেলিকাস্বরূপ, কিন্তু ইহা সত্য। আজ ভারতবাসী অন্তর্দৃষ্টিহারা হইয়াছে, তাই তাহারা আমাদের প্রাচীন ঋষিদিগের গভীর জ্ঞান আয়ত্ত করিতে অসমর্থ—তাহাদের নিকট য়ুরোপের জ্ঞান, য়ুরোপের আদর্শ, য়ুরোপের ইতিহাস বোধগম্য, কিন্তু ভারতের অতলস্পর্শী চিন্তাধারা দুর্জ্ঞেয় রহস্যপূর্ণ। য়ুরোপের সবটাই যেন সত্য, আর ভারতের যাহা কিছু, উপমাত্মক রূপক গল্পমাত্র। হায়, পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভারতবাসীর কি শোচনীয় অধঃপতন! আজ ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব ভারতবর্ষকে বুঝাইতে হইলে য়ুরোপীয় ভাবেই পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হয়—ইহা অপেক্ষা আমাদের অধিক দুর্গতি আর কি হইতে পারে?

কিন্তু জগতের প্রতি কার্য্যে একটা প্রতিক্রিয়া আছে। ভারতবর্ষও তাহার নষ্ট ঐশ্বর্য্য পুনরুদ্ধার মানসে জাগিয়া উঠিতেছে। এই জাগরণ অতি দ্রুতবেগে ঘটিতেছে, এত স্পষ্টভাবে হইতেছে যে পৃথিবীর সকল জাতির দৃষ্টিই সেদিকে পড়িয়াছে। ভারতের এই জাগরণের পশ্চাতে সুনিপুণ অদৃশ্য হস্ত কর্ম্ম করিতেছে, উহা স্বয়ং ভগবানের। ভারতবর্ষ ত একটা নূতন জাতি নয়—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মত উলঙ্গ শিশুর ন্যায় সে ত প্রকৃতির কুক্ষি হইতে এই নূতন বাহির হইতেছে না। ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন সভ্যতা, জগতে যাহার তুলনা নাই—সেই অনন্ত জীবনীশক্তি, যাহা প্রলয়কালেও ধ্বংস হইবার নহে—সেই পুরাতন ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন বৈদেশিক জাতির সংশ্রবে আসিয়া অভাবনীয়

শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষ জাগিতেছে বটে, কিন্তু তাহার জাগরণ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

(ভারতবর্ষ এখনও আপনাকে জানে নাই, অন্ধের মত সে আপনার বিরাট্ অঙ্গে হস্ত সঞ্চালন করিতেছে মাত্র। সে যে কত বড়, কত মহান্, কত শক্তিধর তাহা প্রকৃষ্টরূপে তাহার জ্ঞান-গোচর হয় নাই।) গভীরভাবে এই তত্ত্ব তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। যেদিন আমরা আমাদিগকে প্রকৃতরূপে চিনিতে পারিব, যেদিন আমরা বুঝিব এবং জানিব, আর সেই বুঝা ও জানার ভিত্তি অটল হইবে, যে, আমরা কে ছিলাম, কি ছিলাম, কি করিব, কি করিতে পারি—সেদিন আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় পাইব, আমাদের অতীত জীবনের উদ্দেশ্য কি বুঝিতে পারিব, আমাদের ইতিহাস, আমাদের ভবিষ্যৎ, স্পষ্ট দিবালোকের মত আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইবে—সেই দিনই বুঝিব ভারতবর্ষের জাগরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে—সেই দিনই ভারতবর্ষ সমগ্র জগতের উপদেষ্টা শিক্ষক গুরুরূপে জগৎসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছে। ভারতবর্ষের এই আত্মপরিচয় সর্ব্বাগ্রে লাভ করিতে হইবে—বেদান্তই হউক স্থফি মতই হউক—মন্দির অথবা মসজিদ্—নানক কবির রামদাস চৈতন্য গুরুগোবিন্দ—ব্রাহ্মণ কায়স্থ নমঃশূদ্র প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিচিত্র বিকাশের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা চাই এবং প্রত্যেকটির যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া ভারতের প্রাণশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার পর ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশকেও জানিয়া এবং তাহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ

প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান ভারতবর্ষকে আয়ত্ত করিতে হইবে। পরন্তু আত্মজ্ঞানের উপরেই অপরাপর জ্ঞানগুলি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে।

ধর্ম্ম

ভারতবর্ষ যে ভাবে গড়িয়া উঠিবে উহা ধর্ম্ম। (এই ধর্ম্মবিরহিত হইয়া যে কোন অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হউক না, তাহা ক্ষণস্থায়ী) কিন্তু যত গোল এই ধর্ম্ম লইয়া। গুণাদিভেদে বহুবিধভাবে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, সুতরাং ভূয়োদর্শন ব্যতীত, ভুক্তভোগী না হইলে যথাযথভাবে ধর্ম্মের আস্বাদ জীবনে ঘটিয়া উঠে না। তবে ধর্ম্মবিষয়ক উদার আলোচনা সাধকজীবনে পরম সহায়ক।

ধর্ম্মের জন্য উন্মাদ কে নহে? এ বিপুল বিশ্বের মূল উপাদান কি? ধর্ম্ম নহে কি? আজ জীবনমরণ পণ করিয়া তরুণ যুবকমণ্ডলীকে এই ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে আহ্বান করি; এই নিগূঢ় ধর্ম্মের পথেই মানবজীবনের সকল সার্থকতা বিদ্যমান আছে। ভারতবর্ষ যদি কখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়া জগতে বিদিত হয়, যদি সে শৌর্য্যে বীর্য্যে সাহসে সভ্যতায় বাণিজ্যে ঐশ্বর্য্যে, সকল দিকেই প্রভাবশালী হইতে চাহে, যদি মানবজাতির মুক্তির পথ আবিষ্কার করিবার সে স্পর্দ্ধা রাখে, তবে তাহাকে ধর্ম্মের পথেই অবিচলিতচিত্তে অগ্রসর হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের রাজনীতি, ভারতবর্ষের শিক্ষাদীক্ষা, আচার ব্যবহার, ভারতবর্ষের সাধন ভজন, শুদ্ধি মুক্তি ভুক্তি সিদ্ধি, যাহা কিছু—সকলই এই ধর্ম্মের অন্তর্গত। ভারতবর্ষের শরীর প্রাণ

মন সকলই ধর্ম্ম—জগৎপ্রাণ সমীরণ যেমন সর্ব্বব্যাপী, সেইরূপ ধর্ম্মই আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে ভারতবর্ষকে, অতএব ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ভিন্ন গতি নাই। এই উদার বিরাট্ ধর্ম্মকে বুঝিতে হইবে, জানিতে হইবে এবং ইহাকে লাভ করিতে হইবে। ভারতবর্ষ যে-মুহূর্ত্তে ধর্ম্মলাভ করিবে সেই মুহূর্ত্তেই মূর্ত্তিময়ী মুক্তি তাহার কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিবে।

আজ গতানুগতিক খণ্ড ধর্ম্মের কুহকজাল ছিঁড়িয়া পূর্ণ-যোগাভিলাষী কে আছ ভারতের বীরপুত্র—বাহির হইয়া আইস; প্রাণশিল্পের ঈশ্বর তুমি, নাক টিপিয়া সে তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার অবসর তোমার নাই। সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বাস কর আপনাকে—কেবল বিশ্বাস, সত্যের উপর জলন্ত বিশ্বাস—ধারণা কর তুমি তুচ্ছ নও, তুমি হীন নও, তুমি অবিনাশী—তুমিই তোমার দেহরাজ্যের অধিপতি, তোমার ইচ্ছায় তুমি মুক্ত হইবে, সিদ্ধ হইবে, নির্দ্বন্দ্ব হইবে। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ করিবার জন্য আত্মদ্রোহী সাধক যে খণ্ডবুদ্ধির অহঙ্কারে অনন্ত কালকে খণ্ডিত করিয়া উপাসনার সময় নির্ণয় করিয়াছে, অনন্ত ভগবানের অফুরন্ত রসাস্বাদন করিবার জন্য মানববুদ্ধির চতুঃসীমায় যে সাধন ভজনকে বিধিবদ্ধ করিয়াছে—তাহা টান দিয়া দূরে নিক্ষেপ কর; ভারতবর্ষের যে ধর্ম্ম তাহার বিধি নাই, সে মুক্ত, ব্রহ্মাণ্ডের বিধি তাহার চরণতলে প্রণত। ভারতবর্ষের ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, সত্য—এই পর্য্যন্ত; মুদ্রাযন্ত্র তার পদরেণুকেও প্রকাশ করিতে অসমর্থ, ভারতবর্ষের ধর্ম্ম প্রকাশ করিবার ভাষা নাই—সে অনির্ব্বচনীয়। এই বিরাট্‌কে অবধারণ করিবার জন্য

অবিদ্যাকুহকাচ্ছন্ন ভেদবুদ্ধি মানবজীবনের কয়েক ঘণ্টা ঈশ্বর উপাসনায় মগ্ন থাকিয়া ভগবদ্‌ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে উদ্যত, কি অহঙ্কার ! কি তমঃগুণের পরিপূর্ণ বিকাশ! হে সাধক, আর মুহূর্ত্তকাল গতানুগতিকের আশ্রয়ে বিমুগ্ধ থাকিও না ; ধারণা কর তোমার সমস্ত জীবনটাই সাধনা, তোমাব জীবনটাই ধর্ম্মসাধনার বেদী, তোমার জীবনের মলমূত্রত্যাগ হইতে ঈশ্বর আরাধনারূপ সকল কর্ম্মই ভগবৎ-পূজার উপচার—আর তোমার নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ—যে অনাদি অক্ষয় আত্মা, সেই এই মহাযজ্ঞের পুরোহিত। আজ বলভদ্র শিঙ্গামুখে যে শক্তিমন্ত্র প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা শক্তিসাধনারত বঙ্গসন্তানকে সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিতে হইবে। ভেদবুদ্ধিকে অপসারিত করিয়া অভেদভাবেই ভগবান্‌কে লাভ করা যুগধর্ম্ম। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, মানুষ স্বতন্ত্র "আমির" ধারণায় যুগযুগান্তর একই পথ অনুবর্ত্তন করিতেছে—কেহ বাসনার দাস, কেহ আদর্শের দাস, কেহ খণ্ড খণ্ড দেবতার অধম ভৃত্যরূপেই লীলারত ; আজ পূর্ণলীলার জন্য আমাদের মধ্যে যে পরাৎপর পুরুষ বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে জাগাইয়া তোলাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান সাধনা হউক। ইহাই হইতেছে তাঁহার আদেশ—ইহাই হইতেছে তাঁহার ইচ্ছা।

বাসনার কেন্দ্র হইতেছে প্রাণ, এই প্রাণ আমাদের প্রভু হইতেই পারে না। প্রাণশক্তি আদর্শের অনুগত হইলেও আমরা নিরঙ্কুশ আনন্দের অধিকারী হইব না, কেননা মনও আমাদের

পরিচালক নহে। আমরা ভরিয়া উঠিব ভগবানে, আমাদের মন প্রাণ শরীর পরিচালিত হইবে—ভগবানের ইচ্ছায়, আনন্দের প্রেরণায়। আমরা দ্রষ্টারূপে দেখিয়া যাইব—গুণাদিভেদে আমাদের যন্ত্রনিচয়ের সুখ দুঃখ, ক্রোধ ক্ষমা, প্রেম ঘৃণা প্রভৃতি বিকাশ—আমরা দেখিয়া যাইব আমাদের জীবনে প্রকৃতির অবাধ লীলা, তমের সঙ্কীর্ণতা, রাজসিকতার উদ্দাম কর্ম্মপ্রেরণা, সত্ত্বের নির্ম্মল জ্ঞানলিপ্ত আনন্দ; আমরা উদাসীন রহিব—যতক্ষণ প্রকৃতির দৃঢ় স্বৈরিতা বর্ত্তমান থাকে, তারপর উপর হইতে প্রত্যাদেশের আভাষ বুঝিয়া প্রকৃতি যখন প্রকৃতিস্থা হইবেন, তখন তাঁহাকে পরিচালিত করিব আমারই ইচ্ছায় আনন্দের পথে। তাই বলি জীবনের মধ্যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা যদি করিতে চাও, স্থিতধী হইয়া অবিচ্ছেদ ধারণা কর তুমিই ঈশ্বর—তুমিই সাধক—তুমিই তোমার নিয়ন্তা।

নারী-পূজা

আজ জাগিয়ে তুল্‌তে চাই বাঙ্গালার মাতৃশক্তিকে! আজ সন্তানের করুণ আহ্বানে সাড়া দিতে হবে, নীরব হ'য়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। দীর্ঘ দিন আত্মদর্শনের ফলে আজ সহসা জেগে উঠেছে সমস্ত হৃদয় মন কাঁপিয়ে একটা তীব্র বেদনা, যাহা উন্মাদ করে' তুলেছে আমার অহংকে। আমি ছুটে বেরিয়ে এসেছি, ওগো বাঙ্গালার নারী-শক্তি, তোমাদের চরণপ্রান্তে। আজ তোমাদের সিংহবাহিনীর মহামূর্ত্তি ভক্তের কাছে প্রকাশ কর্‌তে হবে।

চিত্তের ক্ষণিক উত্তেজনায় আজ এমন করে' তোমাদের মন্দির-দ্বারে ভিখারীর মত দাঁড়াই নাই, বুঝেছি জেনেছি তোমাদের অপরাজেয় মহাশক্তিকে উপেক্ষা করে' আমাদের কোন কাজ কর্‌বার অধিকার নাই। ধর্ম্ম সমাজ চুলোয় যাক্‌, মুক্তি মোক্ষের পথেও দাঁড়াতে পারি না, আজ তাই সমস্ত হৃদয়খানা দিয়ে তোমাদের আসন গড়ে' দেব—একবার জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি নিয়ে এসে দাঁড়াও, তোমাদের পূজা করি।

সতীশিরোমণি দক্ষসুতার অংশরূপিণী মাতৃশক্তি অবলার মত একি বেশ! দশপ্রহরণধারিণী দিগ্‌ভুজা—আজ সে রূপ লুকালে কেন? বাহির হও মা বহুরূপধারিণী, ধৃতি ক্ষমা বিদ্যা শক্তি আভরণে অলঙ্কৃতা হ'য়ে সন্তানের সম্মুখে দাঁড়াও, সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি

দিয়ে সহজন্মের আরাধনায় ঐ চরণপদ্মদুটি বিভূষিত করি।

সহিষ্ণুতার দেবীমূর্ত্তি বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে দাসীরূপে অবস্থান করে'ও সন্তানের গৃহ উজ্জ্বল করে' রেখেছ, রোগে শোকে দারিদ্র্যে, পত্নী ভগ্নী জননী রূপে তিল তিল স্নেহবারি সিঞ্চনে অভিশপ্ত বাঙ্গালীজাতিকে রক্ষা করে' এসেছ, আজ তোমায় ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী হ'য়ে জগতের পূজা গ্রহণ কর্‌তে হবে, তাই এই আহ্বান—বাহির হইয়া এস।

বাণী বিদ্যাদায়িনী মহাসরস্বতি,তোমায় শিক্ষিতা করে' তোল্‌বার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাগুলি আজ হাস্যাস্পদ বলে' মনে হচ্ছে। যাঁর রসনায় অগ্নিময় মহাবর্ণ বিরাজ কর্‌ছে, যাঁর মন্ত্রোচ্চারণে ত্রিদিব কম্পিত হ'য়ে উঠে, যাঁর ইচ্ছায় হিমাদ্রি সমতল হয়, সাগর শুখায়ে যায়—তাঁরে কি শিক্ষা দিব? মায়াময়ী আর ছলনা নহে, একবার বাহিরে আইস।

আজ মূর্খ আমরা—তোমাদের ব্রহ্মচর্য্য ব্রত শিক্ষা দিতে অগ্রসর হই, কোথাও বা রিরংসার তাড়নায় কাতর মনে করে' তোমাদের বিধবাবিবাহ প্রচলন মানসে কত অনুষ্ঠানের সৃষ্টি কর্‌তে ধাবিত হই—হায় হায় কি ভ্রান্ত আমরা! কি অহঙ্কার আমাদের! যাঁর কটাক্ষে পৃথিবী ভস্ম হ'য়ে যায়, তাঁরে আমরা মানুষ করে' তুল্‌ব! মাগো, তোমার ইচ্ছায় সকলই সম্ভবে। ইচ্ছায় তুমি স্বহস্তে শিশু সন্তানের মস্তকচ্ছেদ করে' স্বীয় জঠরানল নিবৃত্ত কর, স্বেচ্ছায় কপটচারিণী সেজে স্ব-পতির হৃদয়রক্ত শোষণ কর, স্বেচ্ছায় বারনারী হ'য়ে মোহগ্রস্ত সন্তানগণের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত

করে' দাও। মাগো' আজ শ্মশান-কালীর মূর্ত্তি পরিহার করে' রক্ষা-কালী হও—কোটী সন্তানের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার কর, তপঃ-পরায়ণা উমার বেশে জগৎকে তপস্যায় রত কর, আর কতদিন জগতের বক্ষে তোমার লীলাভূমি ভারতবর্ষকে এমন হীন করে' রেখে দেবে? ভারতবর্ষকে বীর্য্যবান্ কর, ভারতবর্ষ জগতে শীর্ষ স্থান অধিকার করুক।

মায়ের ছদ্মবেশ দূর করে' দিতে বলি। বাংলার নারীশক্তিকে একবার প্রকৃতিস্থা হ'তে বলি, একবার আত্মস্থা হ'য়ে বুঝে নিতে বলি—আর তাদের অবগুণ্ঠন শোভা পায় না, আর তীব্র চপল কটাক্ষে বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ কর্‌বার দিন নাই, তাঁর অবিদ্যার লীলা অবসানপ্রায়। আজ তাঁদের সন্তানদের সম্মুখে দেবীমূর্ত্তি নিয়েই দাঁড়াতে হবে, সস্নেহে মুগ্ধ জীবের জ্ঞান-চক্ষু উন্মোচন করে' দিতে হবে। বাংলার সাধনা এইবার সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌ছে বাংলার দেবীশক্তির আরাধনায়—হে সপ্তকোটী বাঙ্গালী! বিধিপূর্ব্বক এই জননীশক্তিকে উদ্বোধিত করে' তোল।

আমাদের তপস্যা, আমাদের সাধনা, আমাদের ব্রহ্মচর্য্য ব্রত একেবারেই নিষ্ফল হবে—যদি এই মহাশক্তির অনুকম্পা হ'তে বঞ্চিত হই। তাই হে ভক্ত, হে সাধক, হে পূর্ণযোগপ্রয়াসী, ঘরে ঘরে মহালক্ষ্মীদের কর্ণকুহরে কেবল বলিতে থাক, তোমরা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী—তোমরা শত্রুবিমর্দ্দিনী মহাকালী—তোমরা একমাত্র বাঙ্গালীর শক্তি শ্রী—তোমরা আমাদের সহায় হও—তোমরা রক্ষাকালীর মত বিপথ হইতে আমাদের সুপথে

পরিচালিত কর; আর পতঙ্গবৃত্তি পরিহার করে প্রতিদিন স্মরণ কর—নারীশক্তি আমাদের মা—আমাদের প্রকৃষ্ট সহায়স্বরূপা—আমাদের পরম পূজনীয়া—দেখিবে অচিরেই বাংলার নারীশক্তি আমাদের অনুকূল হইয়াছে—তাঁহাদের আকর্ণবিস্তৃত নয়নযুগল দিয়া কামনার বহ্নিরাশির পরিবর্ত্তে শুভাশক্তির বিদ্যুৎরেখা নির্গত হইয়া তোমাদের শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে।
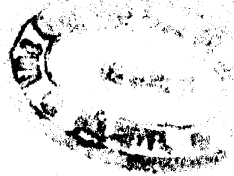
দেবজাতি

কালচক্র ঘর্ঘর শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। কি কর্কশ বিকট তার শব্দ, কি জটিল এবং বীভৎস তার গতি! জগতের বুকে এমন তীব্র বেদনার রেখা আর কখনও সে অঙ্কিত করে নাই, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নিদারুণ ঘটনাবলী কোন কালে চিত্রিত হয় নাই, শ্মশানকালীর এমন তাণ্ডবলীলা আর কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। যুগপরিবর্ত্তন কালেও পৃথিবীব্যাপী এমন ভীষণ আন্দোলনের কখন অবতারণা হয় নাই। একাত্তর দিব্য যুগের অবসানে মন্বন্তর উপস্থিত হয়, মাত্র সপ্তবিংশতি মহাযুগ অন্তে বৈবস্বত মনুর অষ্টবিংশ মহাযুগের কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে, আজ অকালে সপ্তম মনু কি অধিকারচ্যুত হইবেন? পাপভারে ধরাতল কি এতই প্রপীড়িত! কে জানে, দেবলীলা মানুষের অনধিগম্য!

মন্বন্তরকালে শতসূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে ধরাতল বিদগ্ধ হয়, প্রলয়পয়োধিজলে ভূমণ্ডল রসাতলে প্রবেশ করে, এবার নররক্তে পৃথিবীর মলিনতা বিধৌত হইয়া আবার নূতন যুগের আবির্ভাব হইবে, তাই বুঝি ভগবান্ এই দুর্জ্জয় আহবের সৃষ্টি করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের দুর্দ্দমনীয় রক্তপিপাসা অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া যুক্ত-মহাদেশে প্রবেশ করিয়াছে—প্রাচ্যের চীন

জাপানও বাদ পড়িবে না। শিবের প্রলয় বিষাণ গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া আকাশ পাতাল প্রকম্পিত করিতেছে—মদগর্ব্বিত মনুষ্যজাতি পতঙ্গের মত প্রলয়ানলে আত্মাহুতি দিবে—জগতের সর্ব্বাঙ্গই ক্ষত-পূর্ণ হইল, ঔষধ দিবার স্থান নাই।

স্বাধীনতার লীলাভূমি য়ুরোপের দীক্ষাগুরু ফরাসীজাতি আত্মসম্মান সংরক্ষণে সর্ব্বস্ব নরমেধ যজ্ঞে উৎসর্গ করিয়া আমেরিকার সিংহাসনতলে দাঁড়াইয়া কাতরভাবে কি বলিতেছে শোন—শোন, কোটী কোটী নরনারী হৃদপিণ্ড উপাড়িয়া দেশের উজ্জ্বল মণিরত্নসদৃশ বীর হিয়ার সবটুকু শোণিত ঢালিয়াও হিংসা দ্বেষের ভীষণ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই—জগতে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে জেনারল জোফ্রে আমেরিকার সহায্যপ্রার্থী হইয়া বলিতেছেন, **"The French Government implores haste in America's part making no secret of the fact that it is appealing on behalf of a nation almost spent".** কি হৃদয়-বিদারক কারুণ্যপূর্ণ সবিনয় প্রার্থনা! *

মানুষের পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিক দুর্দ্দিনের পরিচয় আর কি হইতে পারে? কেবল ফ্রান্স নয়, য়ুরোপের সকল সভ্যজাতির

---

* প্রবন্ধ প্রকাশ-কালে ইউরোপের যে অগ্নিময় অবস্থা ছিল, আজ তাহার বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ফ্রান্স আজ বিপদ্‌জাল-মুক্ত, মিত্রপক্ষ বিজয়মণ্ডিত, সন্ধিফলে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, কিন্তু মানবজাতির এই প্রলয় সাধনার এখনও পরিপূর্ণ উদ্‌যাপন হয় নাই। মানুষের মন নূতনের আভাসে পুলকিত, পরন্তু এখনও পুরাতন পথেরই অভিযাত্রী।

অবস্থাই এইরূপ—আমাদের দেশে প্লেগে, বসন্তে, বিসূচিকায়, দুর্ভিক্ষে যেরূপ এক একটা দেশ শ্মশানে পরিণত হইতেছে—য়ুরোপের কুরুক্ষেত্রে সেইরূপ গ্রাম নগর একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। আমরা মরিতে বসিয়াছি তামসিকতার তুষারশীতল আলিঙ্গনের নিষ্পীড়নে, আর য়ুরোপ মরিতেছে রাজসিকতার লেলিহান অগ্নিজিহ্বার আকর্ষণে—আজ উভয়েই মরিবে, মৃত্যুই দেখিতেছি এ যুগের বিধিনির্দ্দিষ্ট পন্থা।

মরণের পথ দিয়াই নূতনের আবির্ভাব হয়, মৃত্যুই অমর আত্মার পুরাতন পরিচ্ছদ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। জগতে যে ভবিষ্যযুগ আসিতেছে, সে যুগে পুরাতনের আর আবশ্যক নাই—মানুষ নূতন প্রাণ, নূতন মন, নূতন শরীর লইয়া নূতন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, পুরাতনের আংশিক পরিবর্ত্তনে দেবলীলা পূর্ণভাবে চরিতার্থ হইবে না বলিয়াই আজ মানুষকে মরিয়া নূতন হইতে হইবে—মানুষের পুরাতনের প্রতি অদম্য অনুরাগ, তাই শ্রীভগবান্ সংগ্রামছলে মানুষকে পুরাতনের কুহকজাল হইতে ছিন্ন করিয়া নূতনের দেশে লইয়া যাইতেছেন—সেখানে নূতন বেশভূষায়, নূতন ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়া মানুষ আবার ইহজগতে আনন্দরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পুনরাগমন করিবে। আজ ভারতবর্ষে তাই নূতন সাধনার প্রবর্ত্তন দেখা দিয়াছে—যোগের দ্বারাই, কায়া পরিবর্ত্তন না করিয়াও ভারত নূতন ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে—আত্মবিসর্জ্জনের পরিবর্ত্তে সে আত্মোৎসর্গের অমরমন্ত্রে দীক্ষিত হইবে—তপস্যার দ্বারা অহং নাশ করিয়া দেবজীবন লাভ

করিবে। যাহারা আজ ভাগবত নির্দ্দেশে জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নূতনের উপযোগী হইতে ছুটিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিবেন, ভারতবর্ষই তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে যিনি আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত ভূমণ্ডলের একছত্র সম্রাট্‌রূপে জগৎ শাসন করিবেন, যিনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমুদয় মনুষ্যজাতির ভাগ্যবিধাতা হইবেন, যিনি রাজর্ষি জনকের মত ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় সাধন করিয়া বিশ্বহিতের জন্য বিশ্বের সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন, তিনি ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতেই তাঁর সর্ব্বসমন্বয়কারী বিজয়পতাকা সর্ব্বপ্রথমে প্রোথিত করিবেন। ভবিষ্য স্বর্গরাজ্যের কেন্দ্র হইবে ভারতবর্ষ, জগতের নরনারী এই মহাতীর্থে আসিয়া স্ব স্ব জীবন ধন্য করিবে—ইহাই দেবলীলা, মানুষ তখন বিভিন্ন জাতির ভাবের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এক নূতন জাতির অন্তর্গত হইবে, সে জাতির নাম হইবে দেবজাতি।
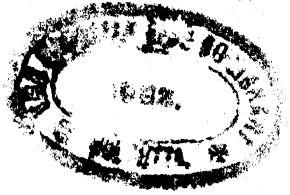
অধ্যাত্ম যুদ্ধ

যুগে যুগে সকল দেশে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হয়, সমসাময়িক অধিকাংশ লোকে যাঁহাদের পাগল বলে। শুধু পাগল আখ্যা লাভ করিয়াই ইঁহারা অব্যাহতি পান না, সময় সময় ইঁহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচারও হইয়া থাকে। ইহার কারণ আছে। মানুষের জ্ঞান স্বভাবতঃই দেশ কাল এবং কারণ অবলম্বনে সীমাবদ্ধ। সুতরাং ভগবান্‌কে মুখে স্বীকার করিলেও সাধারণ জীব নিতান্ত জড়বাদী। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ব্যতীত তাহারা অন্য কোন বিষয়েই আস্থা স্থাপন করে না। জড়ের পশ্চাতে এক চৈতন্যময় শক্তি আছে, একথা সকলেই হয়ত স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা এই অনন্ত চিৎশক্তি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হওয়ায়, যাঁহারা দৈবশক্তিবলে ইহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের ভাব ও ভাষার সহিত ইহাদের কিছুতেই মিল হয় না। পরন্তু এই ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থের সন্ধান পাইয়া উহাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করিবার জন্য সাধকের উত্তম প্রচেষ্টাগুলিই জনসাধারণের নিকট উন্মাদের কাজ বলিয়া পরিগৃহীত হয়। এইরূপ জ্ঞানোন্মাদ উত্তম সাধকগণের সহিত আহারনিদ্রামৈথুনরত সাধারণের আকাশ পাতাল প্রভেদ। প্রথমোক্ত মহাপুরুষগণ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করেন,

তাহার উপর অকাট্য বিশ্বাস করিয়া থাকেন; শেষোক্ত ব্যক্তিগণ বিশ্বাস কাহাকে বলে তাহা জানেই না, তাহাদের নিকট 'বিশ্বাস' আভিধানিক একটা শব্দ মাত্র। যোগদৃষ্টিশালী জনগণ স্থান কাল এবং কারণ ছাড়াইয়া আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করিয়া যে সকল সত্য আবিষ্কার করেন, তাহার প্রতিষ্ঠার জন্ত জীবন মরণ পণ করিয়া বসেন। সাধারণ মানুষ সত্য মিথ্যার ধার ধারে না, ক্ষণবিধ্বংসী জীবনের ভোগ্যবস্তু সংগ্রহে সদা ব্যাপৃত থাকে, এতদতিরিক্ত কার্য্যে কাহারও যত্ন দেখিলে তাহাকে দূরে পরিহার করে এবং তাহাদের কল্পিত সুখরাজ্যে অশান্তির ছায়া পড়িবে ভাবিয়া সমাজ হইতে এইরূপ অসাধারণ তপঃশক্তিসম্পন্ন সাধক-গণের উচ্ছেদসাধনেই কৃতসংকল্প হইয়া উঠে।

মনুষ্যসমাজের মধ্যে এইরূপ দ্বন্দ্ব সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অগ্নিকণা যেমন বৃহদাকার ধারণ করিয়া গ্রাম নগর ভস্মীভূত করিবার সামর্থ্য রাখে, সত্যও সেইরূপ বিশাল মানব সমাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া দেশের সমস্ত অশুভতা ও অসত্য দূরীভূত করিয়া আপনার বিজয়কেতন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। দৃষ্ট অদৃষ্ট সমস্ত বিপক্ষ শক্তিকে গ্রাস করিয়া চিরদিনই সত্য জগতে আত্মকাহিনী প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং যুগে যুগে বিজয়ী বীরের মত আপামর সকলেরই পুষ্প অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আপনার অমর বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

স্থান কাল এবং কারণের বশবর্ত্তী হইয়া এই সত্য আত্ম-গোপন করিয়া অবস্থান করে, ভাগবত ইচ্ছায় ইহাই যখন মুক্ত

এবং স্বচ্ছন্দ ভাবে অগ্নিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, তখনই মানবসমাজের মধ্যে এক প্রবল তরঙ্গ দেখা দেয়। যে সকল যন্ত্র এই সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন বিদলিত করিতে প্রয়াসী হয়, সাধারণতঃ তাহারাই সাময়িক বহু অশুভ শক্তির আঘাত সহ্য করিয়া পরিশেষে উত্তম যুগের প্রতিষ্ঠা করে।

যুরোপ আজ জগতে স্থায়ী শান্তির সংস্থাপনে প্রয়াসী হইয়া এক মহা সংগ্রাম বাধাইয়া বসিয়াছে। মানুষের সকল দুরাশা এই আঘাতে অপসারিত না হইলে ইহা যে কার্য্যে পরিণত হইবে না, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই ইহা বুঝিতে পারেন, কেননা বাহিরের যুদ্ধ ভিতরেরই অভিব্যক্তি মাত্র, ভিতরের পরিবর্ত্তন না ঘটিলে বাহিরের রক্তপাত কিছুতেই চিরদিনের জন্য নিবারিত হইবে না।

মানুষের বর্ত্তমান অশুভ স্বভাবের বিরুদ্ধে জগৎ আজ জাগতিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। কি চূড়ান্ত মোহ এবং অহঙ্কারের খেলা! এই মহাযুদ্ধের উপকরণ—মানুষ, অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র; এই সকল উপাদানই পৃথিবীর, সুতরাং ইহাদের একটা সীমা আছে। যে জাতির এই উপকরণাদির অভাব হইবে, সেই জাতিই চিরশান্তির যে সুখস্বপ্ন উহা বিস্মৃত হইয়া উপস্থিত স্ব স্ব অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আপোষ করিবেই; কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে পার্থিব উপকরণাদির প্রাচুর্য্য ঘটিলে উহারাই আবার এই যুদ্ধের অসমাপ্ত অংশটুকুর অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিবে—সৃষ্টির

দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এইরূপই হইতেছে।

সমস্ত জগৎ যখন আপনাপন ধর্ম্ম সংরক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষও তখন বিধাতার ইঙ্গিত উপেক্ষা করিবে না—সেও জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে; অন্যান্য জাতির যুদ্ধোপকরণ পার্থিব ঐশ্বর্য্য, ভারতের কিন্তু উহা হইবে অধ্যাত্ম-শক্তি। পৃথিবীর সামগ্রী কোনও যুগে স্থান কাল এবং কারণের অতীত হইতে পারিবে না, সুতরাং ঐ সকল অনিত্য বস্তুর অবলম্বনে আজ যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদিগকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির অর্দ্ধ পথ হইতেই আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষ মনুষ্যজাতির মধ্যে একটা অখণ্ড সত্য ও একতার প্রতিষ্ঠা না করিয়া এই অনন্ত সংগ্রাম হইতে কখনই বিরত হইবে না। ভারতবর্ষ তাই আজ শুদ্ধ অধ্যাত্মশক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। জরা মৃত্যু উৎপীড়ন জগতের কোন উপদ্রবেই এই মহামন্ত্রের পরিশেষ হইবে না। এই মহাশক্তির সাহায্যেই ভারতবর্ষ নূতন সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা করিবে। আজ আত্মজয়ের জন্য ভারতবর্ষ যে সাধনা আরম্ভ করিয়াছে, বিশ্বজয় না হওয়া পর্য্যন্ত এ সাধনা সে পরিত্যাগ করিবে না—ইহা অবধারিত জানিও।

পন্থা

সমগ্র বাঙ্গালীর প্রাণশক্তিকে এমন এক উদার বিরাট্ আদর্শের পথে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, যাহাতে জাতিটা তাহাদের সকল সঙ্কীর্ণতা, সকল কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া, অবাধ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে এক বৃহৎ সংহতিতে পরিণত হইতে পারে। খণ্ড খণ্ড আদর্শের অনুগামী হইয়া আজ বাঙ্গালী সহস্র সহস্র গুরুর নির্দ্দেশে বিভিন্ন কর্ম্মস্রোতে ধাবমান, জাতির উন্নতিযুগে ইহা স্বাভাবিক হইলেও এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী ভেদ করিয়া তাহাদিগকে মহাগুরুর অনুগত হইয়া এক বৃহৎ সঙ্ঘের সৃষ্টি করিতে হইবে। স্ব স্ব ক্ষুদ্রত্বের মমতায়, ক্ষুদ্র আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনায়, বৃহত্তের দিকে আমরা যেন দৃষ্টি-হীন না হই। আমাদের গতি অহঙ্কারের কুটিল গোলকধাঁধায় যেন আবদ্ধ হইয়া না পড়ে, আমরা যেন মুক্ত ও বিস্তৃত হইয়া অনন্ত বারিধির অভিমুখে ছুটিয়া চলি!

আমরা আজ ভিন্ন ভিন্ন সাধনক্ষেত্রে অবস্থান করিলেও আমাদের মনে রাখা চাই, যে আমাদের উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—শ্রীভগবানের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হওয়া। সুখে দুঃখে অনুদ্বিগ্ন হইয়া জগদীশ্বরের নির্দ্দেশমত চলিবার জন্যই আমাদের সাধনা, আমাদের জীবন। মনে রাখা চাই প্রকৃতিই আমাদের নিয়ন্ত্রী। পৌরাণিকযুগের কোন নির্দ্দিষ্ট সাধনপদ্ধতির মধ্যে আমাদিগকে

হারাইয়া ফেলিব না—পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানসম্মত করিয়া আমাদের জীবনকে অষ্টপাশে আবদ্ধ করিব না—আমরা ছুটিব অনন্তের দিকে, আমাদের সমস্তখানিকে বিকশিত করিয়া; আমরা সকল ইন্দ্রিয়কে সজাগ ও সতেজ করিয়া রাখিব, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ উপভোগ করিবার জন্য। জীবন ত অঙ্কশাস্ত্র নহে, যে সে পরিমিত রেখার মধ্যে কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে—কতকটা নিরূপিত ব্যবহারিক রীতিনীতির গণ্ডীর মধ্যে পঙ্গু হইয়া রহিবে; সে অনন্ত বিশ্বে অনন্তের আধার হইয়া অনন্তরূপেই বিরাজ করিবে—তাই তাহার গতি হইবে বাধাহীন মুক্ত।

কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিতেই আমাদের জীবন অতিবাহিত হইতেছে, জীবনের অগ্রগতি প্রবল বাধায় নিয়ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। কি রাজনীতিক ক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মসাধনে, কি সমাজসংস্কারের পথে—কোথাও আমাদের গতি অবাধ নহে। বাঙ্গালী যুবকগণ যে উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা যদি সুনিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে বাংলায়ও আজ সোণা ফলিত—বাঙ্গালীর গৌরবে সমগ্র ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হইত।

দেশের নামে, জন্মভূমির উন্নতি কামনায়, বাংলার যুবকমণ্ডলী যে ক্ষতিস্বীকার করিয়াছে, তথাকথিত বাংলার নেতৃমণ্ডলী তাহার শতাংশের একাংশও গ্রহণ করেন নাই, বরং রাজসম্মানে তাঁহারা সম্মানিতই হইয়াছেন—দুঃখের কঠোর তপস্যা যুবকগণই করিয়া চলিয়াছেন; ইহাতে ক্ষোভের কারণ নাই—তাঁহাদের

আত্মোৎসর্গের উপরই ভবিষ্যৎ ভারত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

কিন্তু বাংলার যুবকগণকে আজ ভাগবত নির্দ্দেশে পরিচালিত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি—মানুষের অঙ্গুলিসঙ্কেতে ভক্তের মত সেবকের মত এতদিন পরিচালিত হইয়া, তাহারা যে শক্তি যে জ্ঞান যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে, আজ তাহার অনুশীলনের দিন আসিয়াছে—যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল রুদ্রশক্তি নিয়ত কঠোর কর্ম্মের আবর্ত্তনে স্থির ও শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—শুক্লকেশ স্থবিরের প্রজ্ঞা যুবকমস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—বাংলার কর্ম্মরথে যুবকসঙ্ঘই সারথ্যের কর্ম্ম গ্রহণ করিবে।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে নানা ঘটনার সমাবেশে কুরুপিতামহ চিরকুমার ভীষ্মও বিচলিতচিত্ত হইয়াছিলেন—ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাই বহু বিজ্ঞব্যক্তির বর্ত্তমানেও বয়ঃকনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণই সে মহাসমরের প্রধান নায়ক হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জ্ঞান বৈরাগ্যের পূর্ণাবতার শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য নিতান্ত অল্পবয়স্ক হইলেও ভারতের সঞ্চিত অন্ধসংস্কারগুলিকে এক আঘাতে অপসারিত করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য অতি কিশোর জীবন হইতেই বাংলাদেশে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আর সেদিন, মধ্য বয়সে স্বামী বিবেকানন্দ যে তুমুল ধর্ম্মান্দোলনে সমস্ত পৃথিবী নাচাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহার কথা কাহারও অবিদিত নাই। আজ আবার নবীনদেরই এই দুঃসময়ে বাংলার কর্ম্মপ্রবাহে বাঙ্গালীর জীবন-তরণীর কর্ণধার হইতে হইবে। আজ কাণ পাতিয়া শুনিতে হইবে

ভগবানের আদেশ কি। বাংলায় একদিন যে বিরাট্ আন্দোলনের যুগ আসিয়াছিল আবার কি আর একভাবে তাহারই পুনরাবর্ত্তন করিতে হইবে? আবার কি মোহঘোরে অন্তর্দৃষ্টি দূরে পরিহার করিয়া বাহিরের কোলাহলে উন্মত্তের মত যোগদান করিতে হইবে? না, না, ভগবান্ বলিতেছেন—আত্মস্থ হও, জগৎপ্রাণ সমীরণের সহিত প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি শ্বাসে যে অনন্ত শক্তি আহরণ করিতেছ তাহার অপব্যয় করিও না। অধিকার অধিকার করিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে, জগতের কোন্ জিনিষের তুমি অধিকারী? নিজের দেহেরও ঈশ্বর তুমি নও, এরূপ অবস্থায় তুমি কিসের জন্য উন্মাদ হইয়াছ? সাবধান বাংলার যুবকসঙ্ঘ! যে যোগ যে তপস্যা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, শত প্রলোভনেও যেন তাহা ভঙ্গ না হয়।

অহঙ্কার

অহঙ্কারই অবিদ্যাশক্তির প্রধান অনুচর। অহঙ্কারের ভীষণ কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে না পারিলে যোগপথে কাহারও আসিবার অধিকার নাই। বিদ্যার অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, যশঃ গৌরবের অহঙ্কার বরং ভাল, কিন্তু যাহার ভিতরে ধর্ম্মের অহঙ্কার প্রবেশ করিয়াছে তাহার মুক্তির আশা সুদূরপরাহত।

পৃথিবীর অহঙ্কার প্রকৃতির সম্মার্জ্জনীসঞ্চালনে প্রতি মুহূর্ত্তে অপসারিত হইতেছে। ধনের গৌরব চিরস্থায়ী হয় না, পুত্রের অহঙ্কার নিমেষে তিরোহিত হইতে পারে, রূপের গরিমা কাল-স্রোতে ধুইয়া মুছিয়া শেষ হইয়া যায়, কিন্তু ধর্ম্মের অহঙ্কার অন্তহীন, জন্মজন্মান্তর জীবের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া থাকে—এই ভীষণ ভারবিশিষ্ট পাষাণস্তূপকে নিষ্কাসিত করিয়া মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ হইতে সাধককে বহুদিন কঠোর তপস্যা করিতে হয়।

অধমের সহস্র অপরাধ মার্জ্জনীয়, কিন্তু উত্তমের বিন্দু কলঙ্কও অসহ্য। রূপ যৌবন বিলাস ঐশ্বর্য্য বিদ্যা যশঃ মানের অহঙ্কার পঞ্চভূতজনিত, অথবা দশ ইন্দ্রিয়ের অন্ধতা নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে। ইহা কোথাও তামসিক কোথাও বা রাজসিক, কিন্তু আমি ধার্ম্মিক আমি সত্যবাদী আমি সাধারণ জীব অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীভুক্ত,

কেমনা শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ মানিয়া চলি, যথারীতি সন্ধ্যা-উপাসনা ধ্যান ধারণা প্রাণায়াম সাধনে রত থাকি, দিবানিশি হরিনাম করি, নিরামিষ বা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করি—এরূপ অহঙ্কার মানস-সম্ভূত—ইহা সাত্ত্বিক। পশুবৃত্তিপরায়ণ অধম মানবজীবনাপেক্ষা ব্রতপরায়ণ সাত্ত্বিক অহঙ্কারবিশিষ্ট এই সকল জীব উত্তম হইলেও মুক্তির মন্দিরে ইহারা কদাচ প্রবেশাধিকার পায় না; ইহাদের আগমনে মন্দিরের লৌহ কপাট দৃঢ় আবদ্ধ হইয়া যায়; মহাপাপী অধম নারকীও একদিন ঊর্দ্ধে চাহিয়া একবার ভগবানের পবিত্র নাম গ্রহণ পূর্ব্বক অসংখ্য অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে, ইহারা কিন্তু অহংভাবাপন্ন হইয়া দিবানিশি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া জিহ্বা কৃষ্ণময় করিয়া ফেলিলেও স্বর্গের দুয়ারে পৌছিতে পারে না।

কথাটা অপ্রিয় হইলেও সত্য। আমরা মহাবৈদান্তিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেও সমতাচ্যুত হইতে দেখিয়াছি। বেদান্ত-পাঠদানকালে দূরে বালকের করুণ ক্রন্দনরোল শুনিয়া স্বীয় পুত্রজ্ঞানে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে বাহিরে আসিয়া যখন তিনি দেখিলেন, সে তাঁহার আত্মজ নহে, তখন হাসিয়া শিষ্যের নিকট পুনরাগমন করিয়া বলিলেন, "ও একটা কাদের ছেলে পড়ে' চেঁচাচ্চে—", অহো "সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম" জ্ঞান সাধনার কি শোচনীয় পরিণাম!

যোগের যে ত্রিধারা যে তিনটি পথ দিয়া ভাগবতসন্নিধানে পৃথিবীর জীব পৌছিতে পারে—উহার কোন একটি পথ গ্রহণ করিলেই যে শান্তি বা সমতার অধিকারী হইবে এরূপ মনে করিও

না ; কেননা অহঙ্কার থাকিতে কোন পথেই তুমি অগ্রসর হইতে পারিবে না। "আমি" বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে, পথের ধুলা মাটী মাখিয়া ঘরে ফিরিতে হইবে।

ভগবানের পথ দেখিতে সরল ও সুন্দর বটে, কিন্তু এই সুমহৎ মর্ম্মে পদক্ষেপ করিতে কতটা যে তপস্তার প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য! উপনিষদের সকল ছন্দগুলি আবৃত্তি করিয়া দশজনের মন মাতাইতে পারি—শ্বাস বন্ধ করিয়া দুই হাত ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া বহু লোককে চমৎকৃত করিতে পারি, কিন্তু আপনি মাতিয়া বিশ্বজগৎকে মাতাইতে হইলে, যে পরেশ পাথর স্পর্শ করিতে হয়, যে অমৃতসাগরে সিনান করিয়া আসিতে হয়, তাহার সন্ধান কয়জন জানে এবং কয়জনই বা তাহাতে সমর্থ হয়?

বাংলার যুবকগণ! আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রবল সংঘর্ষণে যুগযুগান্তরের লুপ্ত পথ বাহির হইয়া পড়িয়াছে—ভবিষ্যযুগের সাধনপন্থা, শ্রীভগবান্ যাহা কুরুক্ষেত্র মহাসমরে অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন তাহা অনুধাবন কর। চিত্তাকর্ষক পুরাতন উপায়গুলির আবর্ত্তনে না পড়িয়া ষোলআনা মন এক করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মধুর অথবা কঠোর বাণী শ্রবণ কর—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥"

হে কুন্তিনন্দন! যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্ত যেরূপ ভাবে করিলে আমাতেই সমর্পিত হইতে পারে,

এইরূপ ভাবে (ব্রহ্মার্পণ-বুদ্ধিতে) কর।

কিন্তু আমরা করিতেছি কি? আমাদের "আমি"কে সাধনায় সহায়ে বিরাট্ অহঙ্কারে পরিণত করিতেছি—শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে পণ্ডিত হইয়া উঠিতেছি—নামে রুচি জীবে দয়া করিতে গিয়া মহাভক্ত নামে বিখ্যাত হইতেছি—পরোপকার করিতে গিয়া সুনাম অর্জ্জন করিতেছি—হরি! হরি! আমাদের হইবে কি? ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনপথ থাকিতেও বিভ্রান্তচিত্তে উপায়কেই লক্ষ্য করিয়া তুলিতেছি!

আজ আমরা সর্ব্বাগ্রে "আমি"কে পরিত্যাগ করিতে চাই। তনু মন প্রাণ দিয়া ভগবানের আদর্শকেই মানিয়া চলিব, আমাদের প্রতি কার্য্যের পশ্চাতে যে সেই পরাৎপর পুরুষ বিদ্যমান আছেন, একথা মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইব না। আমরা কার্য্য করিব তাঁহার উদ্দেশ্যে, আমরা ভোজন করিব তাঁহার ভোগাদির জন্য, আমরা বিশ্রাম করিব তাঁহারই ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া। আমাদের আমিত্বটাকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া মিশাইয়া দিব তাঁহাতে, যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত থাকিয়া অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন—আমরা তাঁহার প্রতি বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিব, আনন্দ লাভ করিব, কেননা তিনি সর্ব্বময়—কোমল অথবা কঠিন যে কোন স্পর্শ লাভ করি না, সকলই মধুময় করিয়া লইব, কেননা তিনি ব্যতীত জগতে আর ত সত্তা নাই—জগতের সকল ভোগই তিনি, সুতরাং অনন্ত ভোগের মধ্যেই অবগাহন করিয়া তাঁহাতেই চির অনুস্যূত রহিব।

আমি জানিব না আমি ভক্ত কি জ্ঞানী, আমি জানিব না আমি কর্ম্মী কি সাধক,—আমার তর্ক নাই, যুক্তি নাই, বিচার নাই, সমাজ নাই, ধর্ম্ম নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই—স্বর্গ নরক ইহকাল পরকাল ভুলিয়া, অতীতের সকল স্মৃতি মুছিয়া, সকল সংস্কার সকল ধারণা বিসর্জ্জন দিয়া, এই মুহূর্ত্ত হইতে কেবল একটি কথা জানিব "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

তোমরা আমায় প্রেমিক বলিতে পার, সাধক বলিতে পার, ভণ্ড পাষণ্ড মহাপাপী প্রতারক বলিতে পার—আমার কার্য্য দেখিয়া তোমাদের অভিধানে আমায় ধনবান্ বলিতে পার, দরিদ্র বলিতে পার, বিশ্বনিন্দুক বলিতে পার—জগতের চক্ষে হয়ত ইহার যথার্থতা আছে—কিন্তু আমি জানি আমি এ সকলের কিছুই নহি যদি আমার কোন নাম থাকে সে নাম তাঁর, যদি কিছু উপাধি থাকে সে উপাধি তাঁর, যদি কিছু গুণ থাকে সে গুণ সেই গুণময় শ্রীহরির। আমার সাধন ভজন ব্রহ্মচর্য্য যাহা কিছু, এই সমস্ত আমি ইন্দ্রিয়াদির নির্দ্দেশানুসারে করিব না—আমি যে তাঁহার যন্ত্র তিনি আমায় যাহা করাইবেন আমি তাহাই করিব, তা কে জানে ভাল আর কে জানে মন্দ।

জগৎ এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। জগৎ ছাড়া ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্ম ছাড়া জগৎ নয়। সুতরাং জগতের যাহা কিছু পরিত্যাগ করিয়া জগতাতীত বস্তুর অন্বেষণে বাহির হইতে হইবে, ইহা অযুক্তিকর। জগতে থাকিয়াই জগতের মূলতত্ত্বের সন্ধান করিতে হইবে। যাহা অনন্ত তাহার আবার অংশ কি? একই পুষ্করিণীর জল যষ্টির ব্যবধানে দুইভাগে খণ্ডিত ও বিভক্ত, পরন্তু জল সেই একই। জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে, তবে মায়াভেদে যে বহুর সৃষ্টি হইয়াছে, সেই মায়াতত্ত্ব উপলব্ধ হইলে আমার অজ্ঞান-জনিত যে দ্বন্দ্ব তাহা তিরোহিত হইবে।

অহঙ্কার আমাদের ভেদকে বহুত্বকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। এক একটি অহঙ্কারের ব্যবধানে এক একটি ব্যষ্টির সৃষ্টি, অহং-এর গুণাদিভেদে এই ব্যষ্টি বহু ভাবের; ইহার সমীকরণ ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই ব্যষ্টিত্বকে ভাঙিয়া দিতে হইবে। তবে সমষ্টিশক্তি এই বহু ব্যষ্টির সংমিশ্রণেই সুসিদ্ধ হইবে। ব্যষ্টিগুলিকে লয় করিয়াই যে সমষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে এরূপ নহে—পরন্তু তপস্যার দ্বারা ভেদের মধ্যে বহুর মধ্যে যে অভেদ ও একের সত্তা বিরাজ করিতেছে তাহা বুঝিতে হইবে এবং সেই মূলবস্তুকে লাভ করিয়া তপঃতপ্ত ব্যষ্টিগুলি এক বিরাট

সমষ্টিতে পরিণত হইবে।

বাহিরের কোন ভাব বা কার্য্যের অনুগত হইয়া কোটি কোটি ব্যষ্টি যদি সমষ্টিশক্তিতে পরিণত হয় তাহা স্থায়ী হইবে না, কেননা বাহিরের যে অভিব্যঞ্জনা তাহার সবখানি সত্য নয়—ভিতরের সত্তার ইচ্ছাদিভেদে তাহার প্রকাশ ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। আজ যেখানে যে স্বার্থ যে কর্ম্ম সমগ্রজাতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে, কালের কঠোরচক্রে আবর্ত্তিত হইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে। যেখানে একই স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া একটি জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল, সেখানে বহু আদর্শের উদ্ভব হওয়ায় বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সমষ্টির সৃষ্টি হইতে পারে এবং পরস্পরের ভাবের বৈপরীত্য ঘটিলে দ্বন্দ্ব সংগ্রাম প্রভৃতির আবির্ভাবে জগতে চির অশান্তির সৃষ্টি হইবে।

জগতে যুগে যুগে এইরূপ লীলাই প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। মানবজাতি সমস্বার্থের বশীভূত হইয়াই সমষ্টিবদ্ধ হয়, সে স্বার্থের পরিবর্ত্তনে জাতির মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্ট হইয়া থাকে—ফলে কুল-ধর্ম্ম ও জাতিধর্মনাশে মানবজাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষে যে কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা এই স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া—আজ য়ুরোপও যে শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে তাহাও স্বার্থসিদ্ধির আশায়। আজ যাহারা মিত্রজাতি তাহারা একই প্রকার স্বার্থের ছত্রতলে দাঁড়াইয়াছে। যদি কখন স্বার্থভেদ উপস্থিত হয় তখন মিত্রতা ভুলিয়া পরস্পরের বিপক্ষে যে পরস্পর অস্ত্র-

ধারণ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? যে রুষিয়া একদিন ব্রিটনের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি বলিয়াই প্রতীত হইত, সমস্বার্থের জন্য আজ সে ব্রিটীশরাজের পরম মিত্র। ফরাসীজাতিও ব্রিটনের সহিত চিরবিরোধের কথা বিস্মৃত হইয়া তাহার সহিত প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ। এ মিলনের ভিত্তি কিন্তু চিরস্থায়ী নহে।* ভারতবর্ষ অন্তর্দ্দর্শী তপস্বী, সে এ তত্ত্ব বুঝে—বুঝে বলিয়াই এই মহাবিপ্লবের দিনে সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। স্বপ্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হইলে, যে ঐক্য ও মিলনের স্বপ্নে আজ সমগ্র জগৎ বিভোর হইয়াছে, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সে কঠোর তপস্যা করিবে।

ইহাই ভারতের নবীন দলের আশা ও আদর্শ। ভারতের নবীন সাধক ভারতবর্ষকে একটা জাপান, একটা ফ্রান্স বা ইংলণ্ডে পরিণত করিতে চাহে না। প্রাচ্যের হৃদয়ক্ষেত্রস্বরূপ যে ভারতবর্ষ উহা ভোগভূমি নহে, ভোগেরও বাহিরে যে শুদ্ধ আনন্দ বিরাজ করিতেছে সেই আনন্দেই ভারতের প্রতিষ্ঠা এবং সেইখানে দাঁড়াইয়া, কলুষিত জাগ্রত জগতের সকল জাতির মধ্যে তুরীয় জগতের যে অনাবিল আনন্দধারা তাহাই বর্ষণ করিবে। সে স্বর্গের দুন্দুভি-নিনাদে জগতে এক সুমহান্ শান্তির প্রতিষ্ঠা করিবে।

এত বড় কার্য্যকে সুসিদ্ধ করিতে হইলে ভারতের সাধককে

---

* ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই প্রবন্ধটী লিখিত হয়, তখন রুষিয়া ব্রিটিশরাজের পরম মিত্র, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী ঘটনাবলীর ইতিহাসই প্রমাণ করিয়াছে, যে এরূপ মিলন চিরস্থায়ী হয় না।

জানিতে হইবে, যে, কতখানি কঠোর তপস্যা তাহাকে করিতে হইবে—কত দীর্ঘযুগ তাহাকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে—সিদ্ধির জন্য কতখানি সাহস কতখানি ধৈর্য্য কতখানি বিশ্বাসের তাহার আবশ্যক। আমরা, তাই বাহিরের ফাঁকা আওয়াজে আত্মহারা হইয়া সাধক যাহাতে যোগভ্রষ্ট না হয়, তাহার আয়োজন করিতে চাহি। ভারতবর্ষ যে দিন দিন শুধু আপেক্ষিক উন্নতি লাভ করিবে তাহা নহে, সে জগতের সমুচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া মঙ্গলশঙ্খ-ধ্বনিতে জগৎ মুখরিত করিয়া তুলিবে; হিংসা বিদ্বেষ নরহত্যা চৌর্য্যবৃত্তি, এগুলি মানুষের অশুদ্ধ সংস্কার মাত্র। যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁহারা অনায়াসেই দেখিতে পারেন ভারতবর্ষ দিন দিন কিরূপ উন্নতির পথে ছুটিয়াছে। বাংলার সকল প্রকার কর্মীদের আমরা এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে অনুরোধ করি। রাজনীতিক আন্দোলনের চরম উৎপত্তি যে এনার্কিজম উহা আমোদের স্বভাব-বিরুদ্ধ, উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আমাদের অপরাজেয় নৈতিক শক্তিকে জাগ্রত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। অবশ্য এইরূপ উত্থান আমাদের যে ব্যক্তিগত ক্ষতি ও ত্যাগস্বীকার না করিয়াই হইবে এরূপ বলি না—পদতলে কুশাঙ্কুরও যে বিঁধিবে না, শরীরে কণ্টকবিদ্ধ হইয়া শোণিত-ধারা যে ছুটিবে না, এ কথাও আমরা বলি না; কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়াই আমাদের এই সমুচ্চ আদর্শের পথে ছুটিতে হইবে। আজ অনেকে বাহ্বাস্ফোটে বাহাদুরী দেখাইয়া যে সম্মানে ভূষিত হইয়া গর্ব্ব বোধ করিতে ছুটিয়াছেন, জানিও উহা ক্ষুদ্র-

জনেরই লভ্য সামগ্রী; প্রকৃতিদত্ত বিজয়-তিলক যাহার ভালে শোভা পাইবে, তাহাকে জগতের ভাবী মঙ্গলের জন্ম কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। আমরা 'প্রবর্ত্তকে' আমাদের জীবনের গতি কোন্ দিকে পরিচালিত করিতে হইবে তাহা ক্রমশঃ খুব স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিব। হে সাধক! স্থিতধী হইয়া অপেক্ষা কর, বিধি-পূর্ব্বক প্রণতি সহকারে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্ম প্রস্তুত হও—দেবধাম তোমাদের সম্মুখে।

নূতন মানুষ

এই অনতিকাল মধ্যে বাংলাদেশে যে বিরাট আন্দোলন এবং অভাবনীয় পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে তাহা দেখিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে শীঘ্রই বাঙ্গালীজাতির মধ্যে কোন কিছু মহৎ সৃষ্টি সংসাধিত হইবে। কেননা বৃহৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেই বিপুল পরিবর্তন অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

ধর্ম্মজগতে, রাজনীতিক্ষেত্রে, সামাজিক আচার ব্যবহারে, সর্ব্বত্রই বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে; পুরাতন নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, নূতন পুরাতনের স্থান গ্রহণ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভগবান্ কাহাকেও স্থায়ী আসন প্রদান করিতেছেন না—কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় পরিশুদ্ধ হইয়া না উঠিলে ধর্ম্মে রাজনীতিতে সামাজিকতায় কাহারও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে।

কিন্তু বাঙ্গালীজাতি অতি দ্রুতবেগে জাগিতেছে; সে প্রকৃতির অতি সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে সহস্রবার নিক্ষিপ্ত ও উপেক্ষিত হইলেও, সহস্রবার আপনাকে পুনঃ প্রস্তুত করিয়া প্রকৃতির পরীক্ষামন্দিরে উপনীত করিতেছে। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের যত কঠোর প্রশ্নই হউক না, সে তাহার সমাধান করিবে। এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া দলে দলে নবীনদল অগ্নিপরীক্ষায় আগুয়ান, বিদলিত নিষ্পেষিত লাঞ্ছিত

হইলেও তাহাদের দৃঢ় পণ, জগতের সমক্ষে তাহাদের শ্রেষ্ঠতা যেমন করিয়াই হউক জ্ঞাপন করিবে।

সম্মোহনমন্ত্রে অভিভূত বাঙ্গালী এতকাল আপনাদিগকে অপদার্থ বলিয়াই জানিত; তাহারা জনকজননীর স্নেহপাশ হইতে মুক্ত হওয়াকে পাপ বলিয়া মনে করিত, পুত্রকলত্রের সহিত মোহবদ্ধ নিকৃষ্ট জীবনযাপনকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া স্বীকার করিত। সে অন্ধতা আজ তাহাদের দূর হইয়াছে—তাহারা বুঝিয়াছে, এই মায়াপাশ, এই তামসিকতার লৌহ শৃঙ্খল প্রবল আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সবলে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। প্রকৃষ্টতর জীবনলাভের উপায়, জাতিগত জীবনের স্বচ্ছন্দ বিকাশের উপরেই নির্ভর করে; ব্যক্তিগত জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অন্ধ হইয়া জাতির উন্নতিপথ প্রশস্ত করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ-বংশ দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। মানুষের সহিত মানুষের বংশপরম্পরার যে অমর সম্বন্ধ তাহা আজ প্রত্যেক কর্ম্মীর হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে—অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় মুক্তির জন্য সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করা অপেক্ষা মানবজাতির কল্যাণ ও মঙ্গল বিধানে নিরত থাকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া লোকের মনে দৃঢ় প্রত্যয় হইতেছে—তামসিকতার ঘনঘটা উদ্ভিন্ন করিয়া রাজসিকতার রক্ততিলক ললাটে ধারণ করিয়া নবসূর্য্য উদিত হইতেছে। বাঙ্গালী আজ ফরাসীর রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া শ্বেতাঙ্গগণেরই মত অতি বৃহৎ কামান চালনা করিতেছে, অশ্বারোহণে অপরাপর শ্বেতাঙ্গগণকে পর্য্যুদস্ত করিয়া হো হো রবে হাসিয়া ভাবিতেছে—আমরা নিকৃষ্ট

কিসে? মেসোপটিমিয়ার রণ-প্রাঙ্গণেও দুর্ব্বল বাঙ্গালী মদমত্ত চরণে বীরদম্ভে চলিয়াছে—পৃষ্ঠে তার রণসম্ভার, হস্তে প্রলয়ঙ্করী অগ্নিনালিকা—বাঙ্গালীর জীবনে এই অভিনব পরিবর্ত্তন—ভবিষ্যৎ মহৎ ও মঙ্গল সৃষ্টির সূচনা নহে কি?

কিন্তু এই সকল নূতন ঘটনারাজি আবির্ভূত হইবে, মানুষের জীবনে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখা দিবে, এইরূপ সহজ এবং সরল পথ দিয়াই ভগবান্ আমাদিগকে নানা দিকে নানা ভাবে গড়িয়া তুলিবেন—এই সকল ধারণা কি আমরা করিতে পারিয়াছিলাম? আমাদের ঘোর তামসিক জীবনে যেদিন প্রথমে ভগবানের অঙ্গুলিস্পর্শে তড়িৎ খেলিয়া গেল, সেইদিন হইতে আমরা নানা-দিকে ছুটিয়াছি বটে, কিন্তু তখনও আমাদের অন্ধচক্ষু উন্মীলিত হয় নাই—পরস্পর মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া অনেক সময়, অনেক সামর্থ্য অপচয় করিয়াছি। যদিও জাতির জাগরণকালে এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনীয়তাই অধিক, তাহা হইলেও আজ আমাদের দিন আসিয়াছে, যখন বেশ স্পষ্ট করিয়াই আমাদের চাহিতে হইবে, ভগবানের দিব্য জ্যোতির পথ অনুসরণ করিয়াই ভক্তের মত, অনুগত যন্ত্রের মত আমাদের পরিচালিত হইতে হইবে।

মানুষের মধ্যে ভগবানের যে স্বভাবসিদ্ধ প্রেরণার খেলা তাহারই ইঙ্গিতে আমরা কর্ম্মপর হইব, জগতে আমাদের যে সিদ্ধি তাহা নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে ভোগ করিব। দেবতার ভোগ যদি বৃত্র, বল, নমুচি প্রভৃতি অসুরে আগলাইয়া বসে তাহা হইলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংগ্রামে তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া

মানুষের ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার করিব। সেই ধর্ম্ম-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইলে আমাদের ভিতরে যে দৈবশক্তি আছে অহঙ্কারের নিরসনে তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে হইবে। ব্যক্তিগত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, সমগ্র জাতিটাকে সেই সনাতনভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।

এই মহাকার্য্য সংসাধনের জন্য বাংলাদেশে অসংখ্য কর্ম্মীর প্রয়োজন। আজ সর্ব্বত্র দারুণ ভীতি ও জড়তা এই মহাকার্য্য সম্পাদনে ভীষণ অন্তরায়স্বরূপ অবস্থান করিতেছে। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি—বাহির হইতে কোন সুবিধাই কখন উপস্থিত হইবে না; তপস্যা দ্বারাই, যে ভীষণ অস্পষ্টতা আমাদের সুমহান্ চরিত্রকে আবরিত করিয়া ফেলিয়াছে তাহাকে দূর করিয়া দিতে হইবে। বাঙ্গালীর চরিত্রে দস্যু তস্কর রাজদ্রোহী নরঘাতক প্রভৃতির যে দুরপনেয় কলঙ্ক-লেখা কারণে অকারণে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে; পূত হিন্দুজীবনের যে মহান্ আদর্শ, প্রাচীন ঋষিগণের যে যোগলব্ধ জ্ঞান, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের যে সুমহান্ কীর্ত্তি, এই সকলের অবলম্বনে আমাদের নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতে হইবে। জাতির জাগরণ-কালে বহুমুখী আন্দোলনে উদ্ভ্রান্ত না হইয়া সনাতন গতিটীকে কর্ম্মপর করিয়া তুলিবার জন্য সহস্র সহস্র বাঙ্গালী যুবককে সন্ন্যাসী হইতে হইবে। এই কর্ম্ম সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল উদ্দেশ্যে হইলেও যুগপ্রভাবকে প্রতিহত করিতে হইবে বলিয়া ইহা বিঘ্নবিরহিত নয়। সেইজন্য ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিত, সেবকার্য্যে সর্ব্বস্ব উৎসর্গীকৃত, অত্যাজ্য-

শক্তিসমন্বিত তপস্বী হিন্দুসাধকই ইহার উপযোগী। জানি না প্রকৃতির নিরালা কুটীরে বহুদিন ধরিয়া ভগবান্ যে নূতন মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতেছেন তাহার আবির্ভাবের আর কত বিলম্ব আছে?

নিশীথ চিন্তা

স্তব্ধ গভীর নিশীথে বসিয়া ভাবিতেছি। কিসের ভাবনা? কি ভাবিতেছি তাহার নিরাকরণ নাই—কেবল ভাবিতেছি। সদ্য-পুত্রশোকাতুরা জননী মর্ম্মভেদী হাহাকার করিতে করিতে ক্ষণেকের তরে নিদ্রাভিভূতা, অনাহারে জীর্ণতনু দীনদরিদ্রও বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর সুকোমল অঙ্কে নিশ্চিন্ত, আর আমি ভাবিতেছি—ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু, নয়নে অগ্নিশিখা, হৃদয়ে নিদারুণ জ্বালা—আমার নিদ্রা নাই, আমি জাগিয়া বসিয়া আছি। উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিও এই গম্‌গমে রাত্রিকালে চক্ষু মুদিয়াছে—উত্তমর্ণের রক্তচক্ষুর কথা ভুলিয়া অধমর্ণও প্রশান্তচিত্তে ঘুমঘোরে অচেতন—মহাকুরুক্ষেত্রের গুরু গুরু কামানগর্জ্জনও বুঝি স্তব্ধ—আর আমি চিন্তামগ্ন—কিসের চিন্তা?

আমার চতুর্দ্দিকে বিপ্লব, চতুর্দ্দিকে সর্ব্বনাশের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে—আজ আমার অস্তিত্ব লইয়া পৃথিবীর সকল সামগ্রীর সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে—এই যুদ্ধের তুলনায় কি ছার ইউরোপের সমরাভিনয়—সে যুদ্ধ ত বাহিরের। আমার অন্তর যে আততায়ীর আগ্নেয়াস্ত্রে পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছে, আমি যে কিছুতেই আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেছি না, আমার দুর্জ্জয় দুর্গ যে শত্রুকরতলগত হয় হয় হইয়া উঠিয়াছে—

বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই, অবসর নাই—কি ভীষণ সংগ্রাম!

আমার প্রধান সেনাপতি অহঙ্কার—সেও পদে পদে লাঞ্ছিত অপদস্থ হইয়া রণে ভঙ্গ দিতেছে—আমার দুর্জ্জয় সংস্কার-সেনাবাহিনী বজ্রাহত হইয়া কে কোথায় পলায়নপর—আমি একা, তত্রাচ পরাজয় স্বীকার করিতে পারি না—আমার অস্তিত্বের বিলোপ যাহাতে না হয় তাহার জন্য আমার এই অবিরত শক্তিপ্রয়োগ। আমি চাহি কি? সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াও কোন্ আশায় কাহার জন্য এই মরজগতে অবস্থান করিতে প্রস্তুত? ইহাই আমার চিন্তার বিষয়।

ষড়রিপু মহাযোদ্ধার সহায়ে অসংখ্য সংস্কারসেনা পরিবেষ্টিত হইয়া প্রধান সেনাপতি অহঙ্কার আমায় আজ পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত রাখিয়াছিল, বাহিরের সহিত আমার ত কোন সম্পর্কই ছিল না—পৃথিবীতে যে আমার এত আততায়ী তাহা ত আমি এতদিন জানি নাই। আজ কোন্ শক্তিধর চিরবিজয়ী, আমার পরম সহায়ক রক্ষকগুলিকে শাণিত শায়কে বিনাশ করিয়া আমায় উদ্ভ্রান্ত করিল। আমায় এমন করিয়া চিন্তা করিতে হয় নাই—আজ চতুর্দ্দিকেই অভাব, চতুর্দ্দিকেই বিপ্লব, চতুর্দ্দিকেই অশান্তি, আজ আমি সহায়সম্পদহীন, কিন্তু সহস্র আঘাতেও ত আমার বিনাশ হয় না, অজস্র অস্ত্রপাতেও আমার মৃত্যু নাই, আঘাতে আঘাতে বুঝিতেছি, আমি ক্ষুদ্র নই, আমি তুচ্ছ নই, আমি দুর্ব্বল নই, তাই সংগ্রাম করিতেছি বিনিদ্র হইয়া—আরামের দিন আমার ফুরাইয়াছে।

যাহাদের মুখাপেক্ষায় এতকাল নিশ্চিন্তচিত্তে অলসতাকেই সুখ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, আপনাকে পঙ্গুজ্ঞানে যাহাদের সহায়তাবিহীন হইলে জীবন নিরর্থক হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতাম, আজ তাহাদের তিরোধানে জীবনের আস্বাদ বুঝিতেছি—আমি যে কত বৃহৎ, কত শক্তিধর, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। কিন্তু এখনও জানার শেষ হয় নাই—আমার বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা অপরিপূর্ণ, পূর্ণভাবে আপনাকে জানিব, পরিপূর্ণভাবে আপনাকে পাইব, ইহাই ত আমার চিন্তা, ইহার জন্যই ত আমার সংগ্রাম, এই অবিরাম বিপ্লবের মধ্যেই আমাকে বুঝিতেছি—তাই বিপ্লবই আমার আনন্দের খেলা বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

যতখানি আপনাকে বুঝিতে পারিলে পূর্ণানন্দ লাভ হয়, ততখানি বুঝিবার জন্য আমার যে ব্যাকুলতা, আমার যে প্রচেষ্টা যে উৎসাহ, তাহারই উত্তাপে আমার নিদ্রা আজ সুদূরপরাহত, ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে অবস্থিত—মহাসংগ্রামের ভিতর দিয়াই আপনাকে বিশেষরূপে পাইব এবং এরূপ ঘটিলে আজ যাহাদিগকে হারাইয়াছি তাহাদিগকেও আমারই অমৃতত্ব দিয়া আমার করিয়া লইতে পারিব। পূর্ব্বে তাহারা ইচ্ছামত আমার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল—এইরূপ হইলে, আমিই তাহাদিগকে আমার অমর অস্তিত্বের জন্য সশস্ত্র করিয়া দুর্গরক্ষার ভার প্রদান করিতে পারিব, আমি যে ভুলিয়াছিলাম আমিই ঈশ্বর, আমিই সর্ব্বশক্তিমান্ কর্ত্তা, আমার আদেশের অনুগত হইয়া চলাই যে তাহদের কর্ম ; ইহার বিপরীত আচরণ করিতে গিয়াই আমি বিপন্ন, এবং আমার
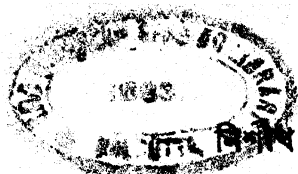
সহচরবৃন্দও বিপর্য্যস্ত।

মুক্ত স্বাধীন ভাবে আমার এই অবাধ লীলা মরজগতে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আমার অপরাজের মহাশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। অপরিসীম শক্তির সহায়তা না পাইলে আমার এই অনন্ত ঐশ্বর্য্য মহাকালের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বজায় থাকিবে না; প্রভু হইয়া ভৃত্যগণকে যথেচ্ছাচারী হইতে দিয়াছি তাই পদে পদে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে হইয়াছে, আমি মুক্ত হইয়াও আবদ্ধবৎ ধারণা জন্মিয়াছে, কিন্তু আজ দেখিতে হইবে কাহার সুতীব্র অস্ত্রাঘাতে আমার কদাকার শবভার ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইয়া আমাকে মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ করিয়া দিল।

শুদ্ধ সত্বগুণহারা হইয়া অমিশ্র রজশক্তির দ্বারা যখন জীবনের খেলা চলিতে থাকে, তখন স্বভাবত: ঘোরতর তামসিকতা আসিয়া জীবনকে লঘু ও তুচ্ছ করিয়া দেয়, কিন্তু আত্মা অবিনাশী, সুতরাং তাহার কার্য্যাদিও গুণভেদে পরিবর্ত্তনশীল হইলেও তাহারও মধ্যে মুক্ত দিব্যানন্দের খেলা লুক্কায়িত আছে। সেই জন্য তমঃশক্তির অভ্যুদয়ে যে জড়ত্ব মানুষের অমর জীবনে বোঝার মত চাপিয়া বসে, স্বয়ং মহাবিষ্ণু জ্ঞান-সুদর্শন-চক্রে তাহার উচ্ছেদসাধন করিয়া আবার শুদ্ধ সাত্বিকভাবে মানবজীবন ভরাইয়া তুলেন—তখন আবার জগতে নূতন যুগের আবির্ভাব হয়। সংগ্রামে যে সাধক শিবের মত শুদ্ধ ও আনন্দময় হইয়া উঠিতে পারে, তাহারই অটল আত্মার ভিতর হইতে স্বর্গের অমৃতধারা বহির্গত হইয়া থাকে—মহাসাধকের সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া সেই পুণ্যস্রোত ধারারূপে জগৎ

পৃথিবীকে পবিত্র করিয়া তুলে। হে সাধক! আজ বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে আবার অমৃতধারা ক্ষরিত হইবার উপক্রম হইয়াছে—এই মহাশক্তিস্রোত ধরাতলে প্রবাহিত করিতে হইলে শিবের মতনই ইহাকে মাথা পাতিয়া ধারণ করিতে হইবে। তাই বসিয়া ভাবিতেছি—আর কতদিন সংগ্রাম করিব, কবে সেই মহাবিজয়া আসিবে, যেদিন অচঞ্চলশিরে অকম্পিতচরণে ধারণ করিব পুণ্য-প্রবাহকে—যে প্রবাহ পবিত্র করিবে, উদ্দীপিত করিবে তমোমগ্ন জাতিকে, ধন্য হইবে বসুন্ধরা স্বর্গের পূত মন্দাকিনী-স্পর্শে—ইহাই আমার চিন্তা।

দেবার জন্মনে—মানুষের গভীরতর প্রেরণা ; কিন্তু প্রবৃত্তির লক্ষ তরঙ্গে পড়িয়া প্রতিনিয়ত সেই মহৎ-লক্ষ্যচ্যুত হইয়া মানুষের বুদ্ধি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। তাই ত করিতে হইবে তপস্যা—বিভ্রান্ত-কারী যে-শত মনোলোভা দৃশ্য নয়ন সমক্ষে ফুলঝুরির মত ফুটিয়া উঠিতেছে, বাহিরের দিকে আশার কুহকিনী ছলনায় মুগ্ধ করিয়া চিত্তকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, মানুষের কল্পনাকে আকাশ-কুসুমের মোহময় স্বপ্নস্তবক রচনায় ব্যাপৃত রাখিয়া আত্মার গভীরতর ঋণী শ্রবণ দুরূহ করিয়া তুলিতেছে—নবীন বাংলাকে কঠোর তপশ্চর্য্যায় সেই সমস্ত বিভ্রম ছিন্ন করিয়া সরল সত্যের পথে চলিতে আরম্ভ করিতে হইবে।

এ একটা গতানুগতিকতাবিরুদ্ধ সম্পূর্ণ নূতন পথ। আমাদের বহির্মুখী যে তরল আবেগময়ী প্রবৃত্তি উপরে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতেই জানে, সর্ব্বাগ্রে তাহাকে মোড় ফিরাইয়া অন্তরের মণি-কোটায়, যেখানে জলোজ্জল নিত্যউৎস্থত আত্মজ্যোতিঃ—তাহারই অভিমুখে সঞ্চালিত করিতে হইবে। আত্মার সে উদ্দীপ্ত আলোকচ্ছটা না পাইলে, সহজ ও সুরম্য মার্গকেই সত্যের অক্ষুণ্ণ তত্ত্বের পথ বলিয়া পদে পদে ভ্রম করিব, ফেণায়িত যে উর্মিমালা উপরে ফুটিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, তাহাকেই বস্তুতত্ত্ব বলিয়া আঁক-

ডিয়া ধরিতে ছুটিব ; যতটুকু হইয়াছে, তাহারই চতুষ্কোণের মধ্যে যাহা হইতে হইবে, সেই অন্তরের অফুরন্ত ভবিতব্যকে সীমাবদ্ধ করিয়া সত্যের অনন্ত বিকাশ বিলম্বিত করিবার বৃথা প্রয়াস করিব।

ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি—সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্ববিভাগে আমাদের চিত্ততারল্য প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়িতেছে। প্রদেশে প্রদেশে যে হাস্যোদ্দীপক প্রহসনাভিনয়টা হইয়া গেল—সেটা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। এই যে মহানগরী কলিকাতায় একটা বৈঠকে সারা ভারতের হিন্দু মুসলমান জননেতৃমণ্ডলী রাজনৈতিক, সামাজিক ধর্ম্মসম্মিলনে ভাগ্যগবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন, এই যে সহস্র সহস্র মুদ্রাব্যয়ে নির্ম্মিত বক্তৃতামঞ্চের উপর দেশের সমষ্টীকৃত মনীষার বিনিয়োগে জাতির আত্মশাসন-তন্ত্র লাভের সঙ্কল্প নিরূপিত হইল, এই যে একটা বিপুল উৎসাহপূর্ণ উত্তেজনাময় উদ্যোগ ও আয়োজন—ইহা মনোমুগ্ধকর আত্মপ্রকাশ সন্দেহ নাই। আমার দেশ, আমার জাতি আজ যাহা হইয়াছে, যে চরিত্রসম্পদ্ লাভ করিয়াছে, এ সকল অসংশয়ে তাহারই বিচিত্র বিকাশ—আমার জাতির এই যে নিখুঁত আলেখ্য নয়নসমক্ষে পাইতেছি, তাহা নয়ন ভরিয়াই দেখিব—কিন্তু দৃষ্টি ঝলসিত হইতে দিলে চলিবে কেন? নয়নের অভ্যন্তরে যে নয়ন, সে যে আজ দেখিতে চায়—এই প্রত্যক্ষ বাহ্যবিকাশের অন্তরালে, অন্তরের গভীরতম তলে ভগবানের কোন্ মহা অভিপ্রায় জলিয়া উঠিতে ব্যাকুল—আমার গভীর কন্দরে কান পাতিয়া না থাকিলে কেমন করিয়া ভগবানের সেই অভ্রান্ত বাণী বক্ত হইতে শুনিব?

এই মহাজাতির মধ্যে ভগবান্ আপনার প্রকাশ চাহিতেছেন, কিন্তু উত্তেজনাপূর্ণ চপল বাহ্যতরঙ্গকেই যদি সারসর্বস্ব মনে করিয়া, হৃদয়ের আধ্যাত্মিক দৈন্যকে শূন্যগর্ভ মনশ্চাঞ্চল্যে, আবেগময় অধীর বুদ্‌বুদবিকাশের দ্বারাই ঢাকিয়া রাখিতে চাই, তাহা হইলে কোন দিন আমরা সে মহাসত্তার সন্ধান আপনার মধ্যে পাইব না। কাল, শক্তি, চিন্তা, উৎসাহ—এ সকল বিধাতার কর্ম্মোপকরণ—তাঁহার উপকরণ তাঁহারই চরণে উৎসর্গপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়া না লইলে, ক্ষুদ্র বুদ্ধির মুগ্ধকরী ছলনার বশে আশার মরীচিকার অনুধাবনে সে সকলের বৃথা অপচয়মাত্র হইবে। অহঙ্কার স্বেচ্ছায় আত্মসংশোধন না করিলে, একদিন প্রকৃতি কঠোর বজ্রাঘাতের দ্বারা সে সংশোধনের ভার আপনারই স্কন্ধে লইবেন।

বুদ্‌বুদ রঙ্গীন হইলেও তাহা বুদ্‌বুদ—অন্তরে যদি তপস্যার ভার না থাকে, অহঙ্কার মানুষকে আকাশে এই বুদ্‌বুদ উড়াইবার খেলাই খেলাইবে—ইহাই স্বাভাবিক। দেশের মনীষীবৃন্দ এমন এক স্থানে গিয়া উপনীত হইয়াছেন, যেখানে হাওয়ায় ফানুষ উড়ানটাই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আগ্রহ থাকিলেও, সে উচ্চ মঞ্চ হইতে নামিয়া তাঁহারা দেশের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিবার সামর্থ্য একেবারেই হারাইয়াছেন, ক্ষণপ্রভার চকিত আলোকে দেশের দিগ্‌ভ্রান্ত চিন্তাশক্তি জাতির প্রাণকেন্দ্র হইতে লক্ষ্যচ্যুত, জাতির তলে তলে পুঞ্জীভূত মর্ম্মবেদনার কন্তুধারায় অবগাহনে অক্ষম—দেখিতেছি, এই বিষম ব্যামোহ ভেদ করিয়া একমাত্র কবির ভবিষ্যদ্দৃষ্টিই জাগ্রত, সুদূরপ্রসারিত। প্রণিধান কর—রবীন্দ্রনাথ

মরীচিকালুব্ধ প্রমত্ত জাতিকে ডাকিয়া যে কালোপযোগী সতর্কতা-বাণী শুনাইয়াছেন—ধর্ম্মের, ত্যাগের, তপস্যার, অপরাজেয় চরিত্র-বলের উপরই নেশনের বনিয়াদ গড়িতে হইবে, নতুবা শুধু বাক্য-ছটায়, চঞ্চল নাট্যলীলায় (Sensational demonstrations) যে স্বপ্নপুরী রচনা করিব, জগতের হাটে তাহার মূল্য দাঁড়াইবে কতটুকু ?

উদীয়মান্ নবীন জাতিকে বলি—উত্তেজনায় আর আত্মবিহ্বল হইয়া অন্তরের প্রেরণাকে ব্যর্থ করিবার অনর্থক প্রয়াসে শক্তিক্ষয় করিও না। যে প্রেরণার মূলে শুধু আশার সুখস্বপ্ন, আত্মোৎসর্গের বিশ্বজয়ী পণ নাই, বাহিরের উত্তেজনা-তরঙ্গেই যাহার গতি ও রতি, অস্থি মজ্জা নিঙ্ড়াইয়া উপযুক্ত মূল্যে অভীষ্ট ক্রয় করিবার সামর্থ্য ও প্রচেষ্টার যেথানে অভাব—তাহা আজ যতই বস্তুতন্ত্র, যতই বিরাট্ মহামন্দির গড়িয়া তুলুক না কেন, স্বপ্ন-তরঙ্গের মত দুর্ব্বার কালস্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইবে! এ সব শৈবালমালা যেমন স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে, তেমনিই স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যাক—ভ্রুক্ষেপ করিও না—এস তুমি, সত্তার সেই অগাধ জলধিগর্ভে নামিয়া—আত্মার সেই দেবজন্মের আদেশবাণী যেখানে উদাত্তস্বরে ধ্বনিত হইতেছে—সেই আদি বীজধ্বনি শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাও—এই তপস্যা ভিন্ন অহঙ্কার-জয়ের আর অন্য পন্থা নাই। স্থির জানিও এই অহঙ্কারের সমাধির উপর যে মহাপ্রেরণা জাগিবে—সে দীপ্ত দিব্যপ্রেরণার সম্মুখে কোনও বাধা কোনও প্রত্যবায় একদণ্ড তিষ্ঠিতে পারিবে না—"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।"

উৎসর্গ

ভারতবর্ষ নিতান্তই ইহবাদী হইয়া পড়িয়াছে। অর্থসামর্থ্য ও নশ্বর শরীরের উপরেই ইহবাদীর ধর্ম্ম ও কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এই সকলের অভাব ঘটিলে মানুষ জড়ের মত অবস্থান করে। কিন্তু আজ ভারতবর্ষকে দেখাইতে হইবে, ঐহিক ঐশ্বর্য্যের উপর তাহার জীবন নির্ভর করে না, আত্মবিধৃত সত্তাই হইতেছে তাহার সবখানি। এই মহা সত্যের উপরই বরং পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য বিধৃত হইয়া আছে।

আমাদিগকে বর্ত্তমান অসত্য ধারণা হইতে মুক্ত হইতে হইলে আত্মোৎসর্গকেই সর্ব্বাগ্রে অবলম্বন করিতে হইবে। বৃন্দাবনে যে লীলার আরম্ভ, কুরুক্ষেত্রে যাহার অঙ্কুর, সে ধর্ম্মযুগকে প্রকট করিয়া তুলিতে হইবে এই কলিযুগে। ভগবদ্‌ভক্তগণ দ্বারাই এই ভাগবতলীলা পরিপূর্ণ হইবে।

ভারতের মহাতীর্থ বৃন্দাবনে শ্যামরায়ের মধুর আহ্বানে বিভোর হইয়া ব্রজের গোপীগণ একদিন শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। আত্মসমর্পণযোগের সে এক সুন্দর নিদর্শন।

যোগের প্রধান তিনটি পর্য্যায় আছে। তপোনিরত ব্রজাঙ্গনাদিগের জীবনের উপর দিয়াও তরঙ্গাকারে এই তিনটি অবস্থা

পর্য্যায়ক্রমে প্রবাহিত হইয়াছিল। সে তরঙ্গের প্রতি আঘাতে তাহারা কখনও আনন্দে কখন বিষাদে কখন আশায় কখন নিরাশায় হাবুডুবু খাইয়াছিল, কিন্তু এই "উঠা নামা প্রেমের তুফানে" তাহাদিগকে আত্মসমর্পণের সঙ্কল্পচ্যুত করে নাই। কলনাদিনী যমুনার পবিত্র তটে দাঁড়াইয়া শিখিপাখাধারী মুরলীধরের চরণে গোপীগণ সর্ব্বস্ব সমর্পণের সঙ্কল্প মাত্র করিয়াছিল, তাহাদের গৃহদেবতা পতি পুত্র ধনজন জীবন যৌবন, সকলই যে তাঁহারই প্রীতির জন্য, এ কথা স্বীকার করিয়াছিল—ইহাই যোগের প্রথম পাদ। কিন্তু অগ্নিপরীক্ষায় এই কথা সত্যে পরিণত হওয়া চাই—এই পরীক্ষার কালই যোগের দ্বিতীয় পর্য্যায়।

শ্রীভগবৎ-চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার পর সাধকের অহঙ্কারে যখন প্রতি মুহূর্ত্তে আঘাত পড়ে, তখন জীবন কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন; গোপবালাগণও শ্রীকৃষ্ণের হস্তে আত্মোৎসর্গের সঙ্কল্প করিয়াই শুদ্ধ ও মুক্ত হইতে পারেন নাই—তাহাদেরও হৃদয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, সাধনপথে অগ্রসর হইয়া প্রতি পদে গতানুগতিক পন্থার বিপরীত আচরণ করিতে গিয়া তাহাদেরও জীবনে প্রবল ঝড় বহিয়াছিল, তাহাদেরও স্থির শুদ্ধ শান্ত জীবনপ্রবাহ উজান পথে ছুটিয়া চতুর্দ্দিকে মহা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই সকল বিক্ষোভের প্রতি আঘাত অতি অপ্রিয় হইলেও শ্রীভগবানের প্রীতিসম্পাদনার্থে যাহারা উহা হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারাই যোগের এই দ্বিতীয় পর্য্যায় অতিক্রম করিতে

পারিয়াছিল। আত্মসমর্পণযোগের দ্বিতীয় স্তরটাই কঠোর ও দুঃখময়। এই অবস্থাতেই দুঃখের যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া সাধককে অবিচল থাকিতে হয়। আপনার জন্মার্জ্জিত স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তনে, স্থায়ী সুখ বিলাসের সহসা তিরোধানে, দৃঢ়মূল ধারণা ও উদ্দেশ্যের বিসর্জ্জনে জীবনের কেন্দ্রস্থ সকল ভাব সকল আশা সকল সহায়ের বন্ধন হইতে সাধককে মুক্ত হইতে হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রজবালাগণের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কয়েকটা অবস্থার কথা আলোচনা করা যাউক।

স্ফুট জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নীরব নিশীথে যমুনাতীরবর্ত্তী দুর্গম বনভূমে কদম্বমূলে দাঁড়াইয়া রসরাজ শ্রীহরি বংশীবাদনে বৃন্দাবন মুখরিত করিয়া, বংশীর সুধাবিগলিত প্রতি মূর্চ্ছনায় যখন গোপীগণের হৃদয় মন আকর্ষণ করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণসর্ব্বস্ব সত্যপরায়ণা সরলা গোপীগণের মনে ভীষণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল; একদিকে গৃহ সংসার সমাজ ধর্ম্ম—অপর দিকে যাহাকে জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাঁহার করুণ আহ্বান—কি কঠোর সমস্যা! এইরূপ ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় অনেকেই অনুত্তীর্ণা হইল। প্রাণারামের সে মুরলীধ্বনি শুনিয়াও দুর্ভেদ্য সমাজ বন্ধনের কঠিন আবেষ্টনে অনেকেই আবদ্ধ রহিল। আর যাহারা বুঝিয়াছিল "তাঁরই হৃদয়রতনমণি আনন্দনিলয়," তাঁরই জীবনের সর্ব্বস্ব, তাঁরই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আদি কারণ, তাহারা সমাজবন্ধন গৃহ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ছুটিল সে বাঁশির সুর অনুসরণ করিয়া! তাহাদের কাণে বাজিতেছিল—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকম্ শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাম্ সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্ত্তী হইয়াও অনেকে সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। লজ্জা ঘৃণা ভয়ে অনেকের হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল—তাহারা ভাবিতেছিল—ছিঃ ছিঃ কি করিলাম, কুল-ত্যাগিনী হইয়া এ কোথায় আসিলাম! এইরূপ অসমর্থা গোপী-গণকে আহ্বান করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"ছিঃ ছিঃ তোমাদের এ কি আচরণ—স্বামী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া এই গভীর যামিনীতে কোথায় আসিয়াছ! ফিরিয়া যাও"। তাহারা ফিরিয়া গেল। ফিরিল না তাহারা, যাহাদের পাপ নাই, পুণ্য নাই, গৃহ নাই, ধর্ম্ম নাই, যাহাদের জীবন পৃথিবীর কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না, পরন্তু যাহাদের জীবন দিয়া এইরূপ অনন্ত কোটী পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। লীলাময় ভগবান্ এই সকল ভক্ত গোপীগণকে কঠোর আত্মসমর্পণযোগের দ্বিতীয় স্তর এইরূপে অতিক্রম করাইয়াছিলেন। এইরূপ অনেক কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া ব্রজগোপীদের চলিতে হইয়াছিল। সে একদিন যে দিন তাহারা নির্জ্জন যমুনাতটে পরিধেয় বস্ত্রগুলি রাখিয়া গাত্রমার্জ্জনের জন্য যমুনাগর্ভে অবতরণ করিয়াছিল—শ্রীহরি অবসর বুঝিয়া সে বস্ত্রগুলি লুকাইয়া রাখিলেন, দেখাইলেন—অন্তর বাহির এক করিয়াই আত্মসমর্পণ করিতে হয়। যোগের প্রথমাবস্থায় জীব, ব্রহ্ম এবং প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুভূত হইলেও পরিশেষে জীবকে ব্রহ্ম হইতে হইবে। এইরূপ হইতে হইলে কেবল রূপ যৌবন জীবন ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ

।।মগ্রী উৎসর্গ করিলেই চলিবে না, পরন্তু ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ গুণ-
।লিকেও সমর্পণ করা চাই। নতুবা জীব কখন ব্রহ্মস্থ হইতে
।ারে না।

তাই আত্মসমর্পণের পর সাধককে দ্রষ্টা হইয়া দেখিয়া যাইতে
হয় ভগবান্ যাহা করিতেছেন। বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে
স্বোপার্জ্জিত সকল সৃষ্টি ঘাতপ্রতিঘাতে বিনষ্ট হইলেও সাধক
স্থির থাকিবেন, কোন মতে ভগবৎ-কার্য্যে সংশয় প্রকাশ
করিবেন না—সংশয়ই এই দ্বিতীয় স্তরে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়।
ভগবানের সকল কার্য্য নির্ব্বিকার চিত্তে অনুমোদন ও দর্শন
করিতে করিতে সাধকের অহং দিন দিন ক্ষীণ হইতে
থাকে, ক্রমশঃ স্বীয় স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান তিরোহিত হইয়া সমতার বিমল
পুলকে সাধক জাগ্রতে সমাধির আনন্দ উপভোগ করেন—ইহাই
সাধনার তৃতীয় স্তর। জীব তখন ব্রহ্মস্থ হইয়া কেবল যে স্বীয়
আধারের উপর পূর্ণ অধিকার বিস্তার করে তাহা নহে, জগতের
বিচিত্র লীলার রহস্যদ্বার তখন সাধকের নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়—
সমগ্র জগতের যাবতীয় আনন্দ উপভোগ করিবার তাহার আর
কোন অন্তরায় থাকে না।

আজ ভক্ত সাধকগণকে বুঝিতে হইবে, ঐহিক ঐশ্বর্য্যের উপর
তাহার জীবন নির্ভর না করিলেও, এই সকল পার্থিব অন্ধ সংস্কার
হইতে মুক্ত হইয়া তাহাকে সিদ্ধির পথে ছুটিতে হইবে, তাহার
আত্মসত্তার উপর এই নূতন সৃষ্টিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।
যে পরিমাণে আমরা আমাদের অমর সত্তার প্রতিষ্ঠাকে লাভ করিব

সেই পরিমাণেই নূতন স্বর্গরাজ্যকে তদুপরি নির্ম্মাণ করিব। আমাদের নূতন জগৎ আজ অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাই তাহার পরিণাম নহে, এই সত্তার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নূতন সৃষ্টি একদিন ত্রিজগৎ অধিকার করিবে—ইহা নিঃসন্দেহ জানিও।

বর্ষশেষে

দেখিতে দেখিতে বর্ষচক্র আবর্ত্তিত হইল। পুরাতন—চক্রনেমির নিম্নে অন্তর্হিত হইল, নূতন উপরে আসিয়া দেখা দিল। আজ যাহা নূতন বলিয়া প্রতীত হইতেছে, কাল আবার তাহা পুরাতন হইবে। পুরাতন পুনরায় নূতন পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া নবীন বেশে দেখা দিবে, কালচক্রে এইরূপ নূতন পুরাতনের খেলা চিরন্তন ঘটিতেছে। 'প্রবর্ত্তকের'ও আজ দুই বৎসর পূর্ণ হইল। ভবিষ্যতে আরও নূতনভাব নূতন ভাষার সহযোগে 'প্রবর্ত্তক' পাঠক-বর্গের হৃদয় মনে নূতন সন্দেশ বহন করিবে। নবীন সাধকদিগের হৃদয় প্রতিদিন তিল তিল করিয়া নূতন হইয়া উঠিতেছে, 'প্রবর্ত্তক' তাহারই দ্যোতক, সুতরাং 'প্রবর্ত্তক' চির নবীন থাকিবে।

বিঘ্নসমাকুল ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আজ দুই বৎসর ধরিয়া শিশুর মত অস্ফুট কণ্ঠে "প্রবর্ত্তক" যে নূতন সঙ্গীত গাহিয়া আসি-তেছে, ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীজাতির হৃদয় যে সহসা তাহাতে মাতিয়া উঠিবে না, সে কথা আমরা জানি। তবে তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার জীবন-বীণার তার ক্রমশঃ উচ্চ সুরে ধ্বনিত হইতেছে —সে সমুচ্চ উদাত্ত সঙ্গীতধ্বনিতে নূতন বাংলা যে দিন দিন জাগিয়া উঠিবে, এ কথা আজ আমাদের মনে দৃঢ়মূল হইয়া বসিতেছে। শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া বাংলার উদার

হৃদয়ক্ষেত্রে যে সকল উন্নতির বীজ রোপন করা হইয়াছিল, সেগুলি ক্রমশঃ ফলপ্রসূ হইয়া, কালের অন্ধকার আবরণে আত্ম-গোপন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। যুগপ্রবর্ত্তক রামমোহন রায়ের অপূর্ব্ব প্রতিভা বিজলীর মত দশদিক আলোকিত করিয়া, আবার নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবার জন্য পথান্বেষণ করিতেছে। ভারতবর্ষের উজ্জ্বল মণিরত্নবিশেষ মহাকর্ম্মী তিলক, উদারপ্রাণ মহাতপস্বী গান্ধী, শ্বেতদ্বীপবাসিনী অপরূপধীশক্তিসম্পন্না বিবি বাসন্তী, ঋষিপ্রতিম রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আজ ভারতের গগনে সমুদিত হইয়া যে তীব্র উজ্জ্বল কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন, তাহাতে বাংলার অতীত যুগের ইতিহাস বিমলিনপ্রায়, বর্ত্তমানের সমুজ্জ্বল বিকাশের নিকট তাহার তুলনাই করা যায় না, কেবল অতীত স্মৃতির অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মত বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকটী মনীষী দীপ্তি পাইতেছেন, আর বৈরাগ্যজ্ঞানপ্রদীপ্ত ভাস্বরদেবমূর্ত্তি ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং তদীয় অনুসঙ্গী বীরসাধক স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র মনোহর মূর্ত্তি উজ্জ্বল দিবাকরের মত অতীত যুগের প্রাধান্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বহু ঘটনার সমাবেশ থাকিলেও, বর্ত্তমান যুগের উপর আর কাহারও প্রভাব ততটা পরিলক্ষিত হইতেছে না।

দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া ভগবান্ রামকৃষ্ণ যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহার সকল বিকাশই বর্ত্তমানের অত্যুজ্জ্বল আলোকসম্পাতে ম্লান বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, বর্ত্তমানের

বহুবর্ণে বিচিত্র সুদৃশ্য রামধনুই আজ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু ইহা অনতিবিলম্বেই কালপটে মিলাইয়া যাইবে। ঠাকুরের সর্ব্বসমন্বয়কারী মহাবীজ মহামহীরুহ-রূপে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। কিন্তু শ্রীভগবানের পূর্ণলীলার পরিপন্থী সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর আসক্তি আজ এই সুমহান্ কর্ম্মে সমূহ বাধা প্রদান করিতেছে, হিন্দুর হৃদয় হইতে এই দুর্জ্জয় অহঙ্কার বিদূরিত না হইলে, এই অহমিকার সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব সাধকদিগের হৃদয় হইতে তিরোহিত না হইলে, শ্রীকৃষ্ণের মহামহিমান্বিত বিরাট লীলার হিন্দুস্থানে পরিস্ফুরণ হইবে না। তাই ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহ-অধ্যুষিত বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গভীর আবর্ত্তে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়াও, যিনি অতীত সংস্কার হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়াছেন, যিনি পৃথিবীর সকল সম্পদ্ সকল গৌরবের অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়া, মাত্র জগজ্জননী মহাকালীর আশীষকেই জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, যিনি বর্ত্তমানের খরতর কর্ম্মপ্রবাহের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, পূর্ণ ভাগবত লীলার অভিনয় আরম্ভ করিবার জন্য, ধীর ও প্রশান্ত-চিত্তে, জননীর আদেশপ্রতীক্ষায় যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন, তিনি নূতন বাংলাকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, যুগাবতার রামকৃষ্ণের মহাবাণী সফল করিয়া তুলিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। হে বাঙ্গালী! শরীর মন ও বুদ্ধিকে সকল প্রকার আশা ও আকাঙ্খার গুরুভারে বিমর্দ্দিত না করিয়া, একমাত্র তাঁপ-

যুগ-বার্ত্তা

বণ্ড ইচ্ছাকে ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হও, ভাগবত শক্তি এই ত্রিলোকেই আজ অভিনয় করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, মানুষের জীবনেই আজ দেবলীলা সুসম্পন্ন হইবে। আজ আপনাকে মহাকালীর চরণে উৎসর্গ করিয়া মহাশক্তিলাভের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হও, শক্তিলাভ না করিলে কিছুরই অধিকার তোমার লাভ করিবার উপায় নাই। যে মহাশক্তি মানুষের জীবনে অসীম ধারণসামর্থ্য জাগাইয়া তুলিবার জন্য অবতীর্ণ হইতেছেন, তিনি বিপুল চিন্তারাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া, মানুষের মানসক্ষেত্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন। হে মানব! হৃদয় প্রশস্ত কর, মানব-হৃদয়েই মহাকালীর নৃত্য আরম্ভ হইবে, হৃদয় ভরিয়া উঠিবে অপরিসীম আনন্দে ও শক্তিতে, তিনি আধারের প্রতি অঙ্গকেই পূর্ণ ও শক্তিসমন্বিত করিয়া তুলিবার জন্যই আগমন করিতেছেন। শরীর মন ও বুদ্ধির অসাধারণ ধারণসামর্থ্যের উপরই নির্ভর করিতেছে আমাদের অষ্টসিদ্ধি, এই অষ্টসিদ্ধি লাভ হইলেই আমরা জগতে অপরাজেয় হইয়া উঠিব, আমাদের ইচ্ছার প্রতিকূলে তখন কোন শক্তিই তিষ্ঠিতে পারিবে না, পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ লীলা তখন অবাধে ধরণীতলে অভিনীত হইতে থাকিবে।